ফিরে আসা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ কসমো স্ক্রিপ্ট ॥ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০৭৩

এই লেখকের অন্যান্য বই :

নিজের চোখে দেখা

দরজার আড়ালে

রবিবার ছাড়া প্রতিটি সকাল একেবারে ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। বাড়িতে ঘড়ির সংখ্যা একুশটি, জ্ঞানব্রতর খুব ঘড়ির শখ। দেশে-বিদেশে যখনই বেড়াতে যান, বিভিন্ন আকৃতির একটি করে ঘড়ি সংগ্রহ করে আনেন। এগুলোতে চাবিও দেন তিনি নিজের হাতে।

এ ছাড়া ডাইনিং হলে আছে একটি বড় দেওয়াল ঘড়ি। এটা জ্ঞানব্রতর বাবার আমলের। এখনো বেশ চলে, দু'এক বছর অন্তর অন্তর অয়েলিং করতে হয় শুধু। টক্ টক্ টক্ টক্ করে সেটিতে প্রতি মুহূর্তের শব্দ হয়। জানিয়ে দেয় যে সময় চলে যাচ্ছে। ঘণ্টা বাজবার একটা খর-র-র খর-র-র আওয়াজ ওঠে, সেই আওয়াজ শুনলেই রান্না ঘরে কান খাড়া করে রতন। ডেকচিতে গরম জল চাপানোই থাকে, ন'টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে সে এসে বলবে, বাথরুমে স্নানের জল দেবো ?

বারো মাসই গরম জলে স্নান করা অভ্যেস জ্ঞানব্রতর।

ন'টা পর্যন্ত বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে তিনি বিভিন্ন খবরের কাগজ পড়েন, রতন এসে গরম জলের কথা বললেই স্নানের ঘরে চলে যান।

সাড়ে ন'টায় খাওয়ার টেবিলে। দশটায় ড্রাইভার গাড়ি বারান্দার নীচে গাড়ি বার করে তৈরী থাকে।

স্মরণকালের মধ্যে কোনো দিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি।

সুজাতা নিজের হাতে কিছু রান্না করে না বটে, কিন্তু খাবার পরিবেশন করে নিজের হাতে। রতন সব কিছু সাজিয়ে রেখে যায় টেবিলের ওপরে।

খাবার টেবিলে এই আধঘণ্টা সময়ই যা সুজাতার জ্ঞানব্রতর সঙ্গে কথাবার্তা হয় সকালে।

জ্ঞানব্রত ওঠেন খুব ভোরে। সুজাতার ঘুম ভাঙতে ভাঙতে প্রায় ন'টা বেজে যায়। জেগে উঠেই কোনো রকমে হুটোপাটি করে মুখ চোখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে ছুটে আসে খাবার টেবিলে। সুজাতা না আসা পর্যন্ত খালি প্লেট সামনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকেন জ্ঞানব্রত। সুজাতা এসেই বিভিন্ন পাত্রের ঢাকনা খুলে বলে, আজ কী কী করেছে দেখি? এঁচোড়ের তরকারি, চিংড়ি মাছের মালাইকারি....পনির দিয়ে পালং শাক করে নি? রতন, রতন!

ছেলে পড়ে দার্জিলিং-এর কনভেণ্ট স্কুলে, মেয়ে উজ্জয়িনীর স্বভাব-টাও অনেকটা মায়ের মতন। কলেজে যাবার ঠিক আধঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠেই হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয়। এজন্য মেয়েকে কোনদিন শাসন করেন নি জ্ঞানব্রত, কারণ স্কুলে প্রতিটি পরীক্ষায় সে ফার্স্ট হয়েছে, পঞ্চম স্থান পেয়েছে স্কুল ফাইনালে। ও রাত জেগে পড়ে। উজ্জয়িনীর জন্ম হয়েছিল ফ্রান্সে, তাই বোধ হয় ফরাসীদের মতন ওর রাত জাগার অভ্যেস।

জ্ঞানব্রতকে খাবার দিয়ে সুজাতা সেই সঙ্গে নিজে চা খায়।

সুজাতার বয়েস এখন ঠিক চল্লিশ, কিন্তু শুধু সাজপোষাকের গুণেই নয়, তার শরীরটা এখনো এমন তাজা যে তার বয়েস তিরিশ বললে কেউ চট করে অবিশ্বাস করবে না। সপ্তদশী উজ্জয়িনী যে সুজাতার মেয়ে তা অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না, ভাবে বুঝি দুই বোন।

সুজাতার চেয়ে ঠিক দশ বছরের বড় জ্ঞানব্রত, পুরুষ মানুষের পক্ষে এ বয়েস কিছুই নয়। শরীরটা তাঁর ভাঙতে শুরু করেছে। মাথায় কাঁচার চেয়ে পাকা চুলই বেশী, চামড়ায় নেই মসৃণতা, চোখের দু'পাশে কালের পায়ের ছাপ। সার্থকতা তাঁর শরীর থেকে মূল্য আদায় করে নিয়েছে।

চা শেষ করে একটা সিগারেট ধরালো সুজাতা। জ্ঞানব্রত তিন মাস আগে সিগারেট-চুরুট-পাইপ একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন, সুজাতা ওসব কিছু চিন্তাই করে না।

সকালের প্রথম সিগারেটটিতে পরিতৃপ্তির সঙ্গে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সুজাতা জিজ্ঞেস করলো:

—তুমি আজ কখন গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে পারবে?

জ্ঞানব্রত বললো, তোমার কখন চাই বলো?

—সাঁড়ে এগারোটায়!

—তার মানে সাড়ে বারোটা তো?

সুজাতা হাসলো।

জ্ঞানব্রতর যেন প্রতি মুহূর্তে ঘড়ির হিসেব, সুজাতা তার ঠিক উল্টো। বাড়ী থেকে যদি সাড়ে এগারোটায় বেরুবে ভাবে তো, কিছুতেই সে বারোটার আগে তৈরী হতে পারে না। জীবনে একটা সিনেমাও বোধ হয় সে শুরু থেকে দেখতে পারে নি।

—কোথায় যাবে ?

—আমাদের মহিলা সমিতির একটা মিটিং আছে।

—ঠিক আছে, সাড়ে এগারোটাতেই গাড়ি আসবে।

—চুমকি এই রবিবার ওর বন্ধুদের সাথে পিকনিকে যেতে চায়। তোমাকে কিছু বলেছে ?

—তোমাকে বলাই তো যথেষ্ট। কোথায় যাবে ?

—ব্যাণ্ডেল।

জায়গাটার নাম শুনতে পেলেন না জ্ঞানব্রত, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন।

ঠিক এই সময়েই তিনি শুনতে পেলেন গানটা।

যোধপুর পার্কে একেবারে আনোয়ার শা রোডের ওপরে মাত্র ছ'বছর আগে তৈরী করেছেন এই নতুন বাড়ী। সামনে বড় রাস্তা, তার উল্টোদিকেই একটা পার্ক, সুতরাং সামনের দিকটা কোনদিন ব্লক্‌ড হবে না। সাত কাঠা জমি, সামনে খানিকটা বাগান পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দোতলায় চারখানা ঘর, নিচে চারখানা। নিচ তলাটা পুরোই ভাড়া দেওয়া হয়েছে চেক কনস্যুলেটের ফার্ষ্ট সেক্রেটারীকে। দুটি গ্যারাজ।

যখন এই বাড়ী বানান জ্ঞানব্রত তখন ডান পাশের তিন কাঠার জমিটাও কিনতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মালিকানা নিয়ে কি যেন গণ্ডগোল ছিল। হঠাৎ এই ছ'মাস আগে সেখানে একটা তিনতলা বাড়ী উঠে গেছে। অনেক লোকজন, বেশ গোলমাল হয় ও বাড়ীতে। বিভিন্ন তলায় একই সঙ্গে রেডিও রেকর্ড প্লেয়ার চলে। এইসব আওয়াজে জ্ঞানব্রত একটু বিরক্ত হন, কিন্তু কিছু করবার উপায় নেই।

সেই রকমই, ও বাড়ির রেডিওতে একটা গান বাজছে। সেদিকে হঠাৎ মন আটকে গেল জ্ঞানব্রতর।

…শহরে ষোলজন বোম্বেটে ;
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে।
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি,
চোরেরও সে শিরমণি
নালিশ করিব আমি, কোনখানে কার নিকটে।
পাঁচজনা ধনী ছিল,
তারা সব ফতুর ··হলো।

গানটা শুনতে শুনতে জ্ঞানব্রতর মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়লো। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—ও কি, তুমি পুডিংটা খেলে না ?

যতই সাহেব মানুষ হন জ্ঞানব্রত, অফিস থেকে দুপুরে তিনি কোথাও লাঞ্চ খেতে যান না। দোকানের খাবার তাঁর একেবারে পছন্দ নয়। ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বার তিনি। সেখানে মাঝে মাঝে যান সাঁতার কাটতে। তারপর দু'এক পেগ মদ্যপান করেন। কিন্তু কোনো খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করেন না।

সকালবেলা বাড়ীর রান্না তিনি খেয়ে যান তৃপ্তির সঙ্গে। আজ বিমর্ষভাবে বললেন, পুডিং ? না, থাক, খেতে ইচ্ছে করছে না।

—হঠাৎ তুমি কেমন গম্ভীর হয়ে গেলে ?

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। কোনো কথা বলছো না। শরীর ঠিক আছে তো ?

—শরীর ? হ্যাঁ, শরীর ভালো আছে।

উঠে বাথরুমে চলে গেলেন তিনি। আয়নার দিকে চেয়ে তার মনে হলো, চুল কাটা দরকার। প্রত্যেক মাসের শেষ রবিবার তার চুল কাটার দিন। আজ মাসের মোটে অর্ধেক। এর মধ্যে চুল বেশী বড় মনে হচ্ছে কেন।

জ্ঞানব্রতর বাবার ছিল মাথা ভর্তি টাক। সবাই বলতো জ্ঞানব্রতরও চুল থাকবে না। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেল, এখনও চুল একটুও পাতলা হয় নি।

বাবাকে অবশ্য খুব ভালো মনে নেই জ্ঞানব্রতর। তিনি যখন মারা যান তখন জ্ঞানব্রতর বয়স এগারো।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে হাতের ঘড়িটা দেখলেন। দশটা বাজতে তিন মিনিট বাকি। এখন তিনি খয়ের ছাড়া একটি পান খাবেন। তারপর গলায় টাই বাঁধবেন। সিগারেট চুরুট ছেড়ে দেবার পর এই পান খাবার অভ্যেসটা হয়েছে।

নিজের ঘরে যেতে বাঁ পাশে মেয়ের ঘর পড়ে। দরজাটা খোলা, সারা বিছানা তছনছ করে, অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছে উজ্জয়িনী। মায়ের চেয়েও বেশী রূপসী হয়েছে, ঠিক যেন এক ঘুমন্ত রাজকন্যা। একটুক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন জ্ঞানব্রত। দেখতে দেখতে এত বড় হয়ে গেল ? আর কিছুদিন পরেই কোনো পর-পুরুষের হাতে ওকে সঁপে দিতে হবে !

ছেলে শুভব্রতর বয়েস চোদ্দ, বছরে মাত্র তিনমাস দেখা হয় তার সঙ্গে।

সুজাতার গালে একটা অন্যমনস্ক চুমু দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ধীরভাবে নামতে লাগলেন তিনি।

গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে দরজা খুলে তটস্থভাবে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভার।

গাড়ি একেবারে চকমকে তকতকে না থাকলেই বিরক্ত হন জ্ঞানব্রত। আজ সেদিকে নজর দিলেন না, উঠে বসলেন।

প্রথমে যেতে হবে বেহালার কারখানায়। কুড়ি-পঁচিশ মিনিট লাগে। এই সময়টুকু তিনি ঘুমিয়ে নেন। গাড়িতে ওঠা মাত্র চোখ বুজে আসে।

আজ ঘুম এলো না।

নিজেই তিনি একটু বাদে অবাক হয়ে ভাবলেন, আমার মন খারাপ লাগছে কেন? কোন কারণ নেই তো! শরীরও খারাপ নয়। তাহলে?

এর পরেই মনে এলো সেই গানের কথাগুলো:

শহরে ষোলো জন বোম্বেটে

করিয়ে পাগলপারা নিল ··

তারপর?

বাকি কথা আর মনে পড়ছে না। সুরটা অবশ্য ঘুরছে মাথার মধ্যে।

এ গানের মানে কী?

জ্ঞানব্রত খুব যে একটা গান-বাজনার ভক্ত তা নয়। তার বাড়িতে বিলিতি রেকর্ডই বাজে বেশী। বড় জোর দু'চারটে রবীন্দ্র সঙ্গীত। এ গান তো মনে হচ্ছে দেহতত্ত্ব বা ঐ ধরনের, এ সব গান কে শুনবে? রেডিও আছে, কিন্তু কক্ষনো খোলা হয় না। জ্ঞানব্রত শেষ রেডিও শুনেছেন ইলেকশনের খবর শোনার জন্য। নিয়মিত রেডিও শোনে মধ্যবিত্তরা।

কারখানার গেটের কাছে যখন গাড়ি এসেছে, তখন জ্ঞানব্রতর মনে পড়লো, নিল তারা সব লুটে! শহরে ষোলজন বোম্বেটে— করিয়ে পাগল পারা নিল তারা সব লুটে…।

জ্ঞানব্রত এই গানটা যেন আগে কখনো শুনেছেন।

কবে, কোথায় ?

কারখানার দেখাশুনোর ভার তাঁর ভাগ্নে শেখরের ওপর। জ্ঞানব্রত এ কারখানা নিয়ে মাথা ঘামান না, শিগগিরই মাদ্রাজে আর একটি কারখানা খুলবেন, সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন। তবু রোজ একবার করে এখানে আসেন। শেখর কিছু কিছু ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, জ্ঞানব্রত সেই সব রিপোর্টের ওপর এক নজর চোখ বুলিয়ে হ্যাঁ কিংবা না বলে দেন।

একুশ বছর আট মাস বয়েস পর্যন্ত জ্ঞানব্রত ছিলেন এক অতি সাধারণ রিফিউজি ছোকরা। পড়াশুনোয় ভালোই ছিলেন, কিন্তু শৈশবে পিতৃহীন বলে মামার বাড়িতে মানুষ, টিউশানী করে নিজের খরচ চালাতে হতো।

মামাদের অবস্থা ভালো ছিল না। জ্ঞানব্রতর মা ছিলেন তার ভাইদের বাড়ীতে বিনি-মাইনের রাঁধুনি।

টুথপেষ্টের ছিপির মধ্যে যে একটা ছোট্ট গোল শোলার চাক্তি থাকে, সেই দিয়ে ব্যবসা শুরু। ঐ ছোট্ট জিনিসটাও খুব জরুরী, ওটা থাকে বলেই টিউব থেকে টুথপেষ্ট বেরিয়ে আসে না। অত ছোট জিনিস কোন টুথপেষ্ট কোম্পানি নিজে বানায় না, বাইরে থেকে কেনে।

মূলধন ছিল মাত্র দেড়শ টাকা। একটা পাঞ্চিং মেশিন আর কিছু

কাঁচা মাল। কারুকে না জানিয়ে জ্ঞানব্রত শুরু করেছিলেন এই কারবার, পুরোটা লোকসান গেলেও তো তার নিজের দেড়শো টাকাই যাবে।

এখন তিনি একটি প্রখ্যাত মার্কিন টুথপেষ্ট কোম্পানীর সঙ্গে কোলাবোরেশনে এদেশে তৃতীয় টুথপেষ্ট কারখানা খুলছেন। মামাদের উপকারের ঋণ শোধ করে দিয়েছেন তিনি, প্রত্যেক মামাকে নিয়েছেন কোম্পানীর ডিরেক্টার বোর্ডে, দু'জন মামাতো ভাইকে বিলেতে পড়িয়ে এনেছেন। শুধু তাঁর মা-ই কোন সুখভোগ করে যেতে পারলেন না। সবেমাত্র এই বেহালার কারখানাটা লীজ নেওয়া হয়েছে, সেই সময় মারা গেলেন মা।

অফিস ঘরে বসে কাগজপত্র দেখছেন জ্ঞানব্রত, হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন—শেখর, তুই এই গানটা জানিস? শহরে ষোলজন বোম্বেটে। করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে।....

শেখর একেবারে অবাক।

তার মামা অত্যন্ত রাশভারি মানুষ। কাজের মধ্যে কোনো রকম ছ্যাবলামি করবেন তিনি, এ তো কল্পনাই করা যায় না। এ কি একটা বিদঘুটে গানের কথা জিজ্ঞেস করছেন!

—গান? এটা কী গান?

জ্ঞানব্রত হাসলেন।

পুরনো অভ্যেস মতই বাঁ হাতের দুটি আঙুল কাঁচি করে ধরলেন মুখের সামনে, যেন সেখানে রয়েছে অদৃশ্য সিগারেট।

—হঠাৎ এই গানটা শুনলাম রেডিওতে। তারপর অনবরত এটা মাথার মধ্যে ঘুরছে।

—রেডিওতে শুনলেন ?   কখন ?

—আজই খেতে বসে···

নতুন নামকরা শিল্পপতি এবং সদা ব্যস্ত জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জি সকাল বেলা খাবার টেবিলে বসে রেডিওতে পল্লীগীতি শুনেছেন—এ দৃশ্যও শেখরের পক্ষে কল্পনা করা দুষ্কর। পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসা রেডিওর গান নিয়ে কে আর মাথা ঘামায় ?

—মনে হচ্ছে যেন এই গানটা আমি আগে কোথাও শুনেছি। কোথায় শুনলাম বল তো ?

—আমি তো এরকম গান কক্ষনো শুনি নি !

—তোর বাড়িতে ফোন কর তো ?

—বাড়িতে ?

—হ্যাঁ, তোর মাকে একবার ডাক।

দুই দিদি জ্ঞানব্রতর। বড় দিদি থাকেন ভূপালে। শেখরের মা ছোড়দি। ছেলেবেলায় খুব সুন্দর গান করতেন। তারপর যা হয় অধিকাংশ বাঙালী মেয়েদের। বিয়ের পর গান বাজনার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে যায়।

—ছোড়দি, আমি গেনু বলছি।

বয়েসে বড় দিদি হলেও প্রতিমা তাঁর এই ছোট ভাইকে একটু সমীহ করেন। জীবনে এতখানি উন্নতি করেছে সে, তাঁর ছেলেকে বিরাট চাকরি দিয়েছে। এক সময় গেনু বলে ডাকলেও এখন বলেন জ্ঞান।

—কী রে, কী হয়েছে ?

—ছোড়দি, তুমি তো এক সময় অনেক গান করতে। তুমি এই গানটা জানো ?   শহরে ষোলোজন বোম্বেটে···

—না তো !

—ভালো করে ভেবে দেখো, কখনো শোনো নি ?

—না। হঠাৎ এই কথা জিজ্ঞেস করছিস যে ?

—এই গানটা আমার মাথায় গেঁথে গেছে, কিছুতেই তাড়াতে পারছি না। আগে শুনেছি মনে হচ্ছে, খুব সম্ভবত ছেলেবেলায়।

—সুজাতা কেমন আছে ?

—ভালো আছে। তোমাকে সুরটা শোনাবো ? তা হলে হয়তো তোমার মনে পড়তে পারে।

অবিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য ! আরও একজন কর্মচারী এই সময় ঘরে ঢুকেছে। ইংরেজিতে যাকে বলে স্কাণ্ডালাইজড, শেখরের সেই অবস্থা। গোল্ডেন স্টার টুথপেস্ট কোম্পানির একান্নভাগ শেয়ারের মালিক জ্ঞানব্রত অফিস ঘরে বসে অত্যন্ত ব্যস্ত সময়ে টেলিফোনে পল্লীগীতির সুর শোনাচ্ছেন দিদিকে। মাথাটা খারাপ হয়ে যায় নি তো ? ঘড়ির কাঁটা ধরে এই লোকের জীবন চলে।

প্রতিমা টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে ঠিক বুঝতে পারছেন না, এই সময় তাঁর কি বলা উচিত। তাঁর ঝোঁক ছিল নজরুল ও অতুল প্রসাদের গানে; সেও কতকাল আগের কথা। এ গান তো তিনি শোনেন নি কখনো। তবু গুরুত্বপূর্ণ ছোট ভাইকে খুশী করবার জন্য তিনি আমতা আমতা করে বললেন :

—হ্যাঁ, কেমন যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

—এর পরের কথাগুলো জানো ?

—না। খুশীকে অনেকদিন দেখিনি। একদিন আসতে বলিস না আমাদের এখানে।

উজ্জয়িনীর ডাক-নাম খুশী! সে তার মাসীদের ভক্ত, পিসীর বাড়ীতে যেতে চায় না।

—আচ্ছা বলবো। তা হলে গানটা তুমি জান না। তোমার কাছ থেকে শুনি নি।

—রাস্তার ভিখিরিরা অনেক সময় এইরকম গান গায়।

টেলিফোনের লাইন কেটে দিয়েই অভ্যেস মতন ঘড়ি দেখলেন জ্ঞানব্রত। ঠিক সাড়ে এগারোটা বাজে। সুজাতাকে গাড়িটা পাঠাবার কথা ছিল।

এরকম ভুল তার কখনো হয় না।

সুজাতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বিলেতে, সেই প্রথমবার জ্ঞানব্রত ও দেশে গিয়েছিলেন। এখন বছরে দু'বার তিনবার তাঁকে বিলেত-আমেরিকায় যেতে হয়। সুজাতা তখন ওখানে পড়াশুনা করছে। আলাপের তৃতীয় দিনেই জ্ঞানব্রত বুঝেছিলেন, এই মেয়েটিকে না পেলে তাঁর চলবে না। প্রথম যৌবনেই ব্যবসা শুরু করে তার মধ্যে একবারে ডুবে গিয়েছিলেন জ্ঞানব্রত, কোনো মেয়ের দিকে তাকাবার সময় পান নি, সুজাতাকে দেখেই তার মনে হয়েছিল যদি বিয়ে করতে হয় তা হলে একেই, নইলে আর কারুকে নয়।

সেবার বিলেতে থাকার কথা ছিল তিন সপ্তাহ, থেকে গেলেন দু'মাস।

কেনসিংটনের একটা সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে জ্ঞানব্রত দুম করে সুজাতাকে বলেছিলেন, আপনি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি থাকেন, তা হলে কাল আমি আসবো, নইলে আজই আমাদের শেষ দেখা।

সুজাতা বলেছিল, কিন্তু আর পাঁচ মাস বাদে যে আমার পরীক্ষা !

—আমি এখানেই বিয়েটা সেরে দেশে ফিরে যাবো। আপনি পরীক্ষা টরিক্ষা দিয়ে তারপর ফিরবেন।

—কেন, আমি দেশে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না ?

—না।

—এত অধৈর্য কেন আপনি ?

—আমি চলে গেলেই আমার চেয়ে যোগ্য কেউ আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেলতে পারে।

সুজাতা হাসতে হাসতে বলেছিল, আমার ধারণা ছিল, যারা প্রেমে পড়ে বিয়ে করে, তারা পরস্পরকে তুমি বলে। এ রকম গুরু-গম্ভীর ভাষায় কেউ যে কখনো বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তা আমি জন্মে ভাবি নি।

আসলে জ্ঞানব্রত লাজুক। ব্যবসায়ীদের জগতে তিনি গম্ভীর মানুষ বলে পরিচিত, সেটা লাজুকতারই একটা দিক। সুজাতাকে বিয়ের দিন পর্যন্ত 'আপনি'র বদলে তুমি বলতে বাধো বাধো ঠেকেছে !

তক্ষুণি নিজের গাড়িটা সুজাতাকে পাঠিয়ে দিয়ে কারখানার একটা গাড়ি নিয়ে তিনি চলে এলেন ষ্টীফেন কোর্টে তাঁর অফিসে।

বিকেল পর্যন্ত সেই গানটা তার সঙ্গ ছাড়লো না। যতই কাজে মন দেয়ার চেষ্টা করেন, সেই গানটা তাঁর মাথায় ঘুরে ফিরে আসে। এখন তার মনে বদ্ধমূল জন্মে গেছে যে এই গানটা তিনি পুরো শুনে-ছেন তো নিশ্চয়ই, শুধু তাই নয়, পুরো গানটাই তিনি জানতেন। কিন্তু কার কাছে যে শুনেছেন তা কিছুতেই মনে পড়ছে না।

অফিস ঘরে সংলগ্ন তাঁর নিজস্ব বাথরুম। বিকেলে সেখানে ঢুকে তিনি দিব্যি গুনগুনিয়ে গাইতে লাগলেন গানটা ঃ

শহরে ষোলো জন বোম্বেটে

করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে

তারপর ? তারপর ?

জ্ঞানব্রত অনুভব করলেন এই গানটার বাকি কথাগুলো না জানতে পারলে তাঁর জীবনে আর সুখ আসবে না। রাত্তিরে ঘুমোতেও পারবেন না তিনি।

কিন্তু এ গান কী করে উদ্ধার করা যাবে ? সকালবেলা কোন এক অখ্যাত গায়ক রেডিওতে গেয়েছে এই গান। কে তা শুনেছে বা মনে রেখেছে ? অন্তত জ্ঞানব্রত যে জগতে ঘোরাফেরা করেন সেখানকার কেউ শুনবে না এই গান।

ফোন তুলে জ্ঞানব্রত চাইলেন আর সি চৌধুরী অ্যাণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের নাম্বার !

—রশীদ সাহেব ? আমি জ্ঞানব্রত চৌধুরী বলছি। টোকিও থেকে কবে ফিরলেন ?

—এই তো পরশু। আপনার জন্য একটা ঘড়ি এনেছি। আমার গরীবখানায় কবে আসবেন বলুন ? নেক্সট সানডে ?

—না, ঐ রবিবার আমি থাকবো না, পরে হবে একদিন। আপনাকে অন্য একটা দরকারে ফোন করছি। আপনার বাড়ির পার্টিতে একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, কলকাতা রেডিও ষ্টেশনের নতুন ষ্টেশান ডিরেকটার, কি যেন নাম ভদ্রলোকের ?

—এই রে, নাম তো জানিনা আমিও। কেন, খুব দরকার ?

—আপনার বাড়িতে নেমন্তন্ন করলেন, আপনি তার নাম জানেন না ?

—আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমার ওয়াইফ ওনার ওয়াইফের খুব বন্ধু। এক সঙ্গে পড়তেন কলেজে। সেইজন্য আপনার ভাবীই নেমন্তন্ন করেছিলেন ওদের দু'জনকে। নামটা বলেছিলেন বটে, এখন ভুলে গেছি।

—আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে নামটা জানা যায় না ?

—কেন যাবে না ? হঠাৎ রেডিওর ষ্টেশন ডিরেকটারকে আপনার কী দরকার পড়লো ? পাবলিসিটি দেবেন ?

—না, না, সে সব কিছু নয়, অন্য একটা দরকার !

দশ মিনিট বাদে রশীদ সাহেব জানিয়ে দিলেন যে রেডিও ষ্টেশনের ঐ পরিচালকটির নাম পি সি বড়ুয়া।

এবার জ্ঞানব্রত চাইলেন রেডিও ষ্টেশন।

—আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রশীদ সাহেবের বাড়ির পার্টিতে, মনে করতে পারছেন তো ?

—নিশ্চয়ই। গোল্ডেন স্টার টুথপেষ্ট তো ? আমেরিকাতে আমি যখন পড়াশুনো করতুম, তখন থেকেই ঐ টুথপেষ্ট ব্যবহার করি।

—আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ দরকার ছিল।

—বলুন।

ঠিক মুহূর্তে সামলে গেলেন জ্ঞানব্রত। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি! তাঁর পক্ষে রেডিওর ষ্টেশন ডিরেক্টরকে টেলিফোন করে হঠাৎ একটা পল্লীগীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা একেবারেই চলে না। মাষ্ট নট ডান।

—আপনি আজ সন্ধেবেলা কি ব্যস্ত আছেন? ক্যালকাটা ক্লাবে একবার আসতে পারবেন?

—ক'টার সময়?

—এই ধরুন সাড়ে সাতটা-আটটা?

—আচ্ছা আসবো। এই ধরুন এইটস! আপনি কোথায়....

—আমি ওপরের বার রুমে থাকবো।

—ঠিক আছে দেখা হবে। আমার স্ত্রী সেদিন বলছিলেন, আপনার স্ত্রীর হাসিটি একেবারে গোল্ডেন স্টার স্মাইল। হাঃ হাঃ হাঃ।

জ্ঞানব্রত চিন্তা করে দেখলেন আজ সারা দিনে তিনি প্রায় কিছুই কাজ করেন নি। কী একটা সামান্য গান তাঁকে একেবারে পাগলা করে তুলেছে। আজই এর একটা হেস্ত নেস্ত করে পুরো ব্যাপারটা মন থেকে একেবারে চুকিয়ে ফেলা দরকার।

ঐ বোম্বেটে শব্দটা! জ্ঞানব্রতর যেন মনে হচ্ছে এই গানেই তিনি প্রথম বোম্বেটে শব্দটা প্রথম শোনেন। শহরে ষোলোজন বোম্বেটে ....এ লাইনটার নিশ্চয়ই অন্য কোন মানে আছে। পুরো গানটা শুনলেই তা বোঝা যাবে।

সুজাতাকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিলেন, আজ তার ফিরতে দেরি হবে।

রেডিও'র ষ্টেশন ডিরেক্টর ক্যালকাটা ক্লাবে আসবেন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে। মাঝখানে অনেকটা সময়। জ্ঞানব্রত সাধারণত দু'টোর পর অফিসে থাকেন না। এক একজন লোক দিন রাতের বেশীর ভাগ সময়ই অফিসে কাটাতে ভালোবাসে। খুব বেশী কাজের চাপ থাকলে জ্ঞানব্রত ফাইল পত্র বাড়িতে নিয়ে যান কিংবা ম্যানেজারদের বাড়িতে ডাকেন। তার বাড়িতে এ জন্য দু'খানা আলাদা ঘর আছে।

সন্ধ্যের সময় অফিসের বদলে বাড়িতে বসে কাজ করার একটাই কারণ, খুব বেশীক্ষণ স্যুট টাই মোজা জুতো পায় থাকা পছন্দ করেন না তিনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে এই সব ধড়া-চুড়ো ছেড়ে পাজামা পাঞ্জাবী আর চটি পরলেই স্বস্তি।

আজ আর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা হবে না। এখন বাড়ি ফিরে আবার ক্যালকাটা ক্লাবে আসা একটা ঝক্কির ব্যাপার.। জ্ঞানব্রত এখন বেশ লজ্জা পাচ্ছেন। কেন পি. সি বড়ুয়াকে ডাকতে গেলেন। কি বলবেন তিনি ওঁকে? হঠাৎ এরকম ছেলেমানুষী কেন বা চাপলো কে জানে।

চেয়ার ছেড়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন জ্ঞানব্রত। সাত তলায় ওপরের এই ঘর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ঐতো কাছেই রেডিও স্টেশন। তিনি ইচ্ছে করলেই ওখানে গিয়ে দেখা করতে পারতেন বড়ুয়া সাহেবের সঙ্গে। কিংবা ওঁকে বলতে পারতেন, অফিস থেকে ফেরার পথে টুক করে দু'মিনিট থেমে যাবেন এখানে। কিন্তু সেটা রীতি নয়। অল্প পরিচিত হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তিদের ক্লাবে ডাকাই নিয়ম।

ডালহাউসি স্কোয়ারের চার পাশ এখন লোকে লোকারণ্য। ওপর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে, বুঝি কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেঁধে গেছে। সে সব কিছুই নয়, অফিস ছুটির সময় এ রকম ভিড়ই হয়।

অন্য দিনের মত ঠিক ছ'টার সময় বেরোলেন জ্ঞানব্রত।

সুজাতা বিকেলের দিকে আবার গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। না দিলেও অসুবিধে ছিল না। অফিসের অন্য যে-কোন একটা গাড়ি নিতে পারতেন। ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়ালো। ভেতরে উঠে বসে তিনি বললেন, ইডেন গার্ডেনের দিকে চলো।

শিক্ষিত ড্রাইভার কখনো বিস্ময় প্রকাশ করে না।

সন্ধ্যের সময় বড়বাবু ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খেতে যাবেন, এটা প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবু সে কোনো কথা না বলে সেদিকেই গাড়ি ঘোরালো।

এক্ষুণি ক্যালকাটা ক্লাবে যেতে চান না জ্ঞানব্রত। সেখানে চেনা শুনো অনেকের সঙ্গে দেখা হবে। এই সময় যারা যায়, তারা মদ খেতেই যায়। তাদের পাল্লায় পড়লে তাঁকেও মদের গ্লাস নিয়ে বসতে হবে। কিন্তু তাঁর মদ খাওয়ার প্রতি বিশেষ ঝোঁক নেই, মাঝে মাঝে দু'তিন পেগ খান বটে। খুব একটা উপভোগ করেন না।

পি. সি বড়ুয়াকে তিনি বার-রুমে আসতে বললেন কেন? খেতে বসলে তো ড্রিংক না নেওয়ার কোনো মানে হয় না। কিছু না ভেবেই তখন বলেছেন। এখন বুঝলেন একটা কারণও আছে। রশীদ সাহেবের বাড়ির পার্টিতে তিনি পি.সি বড়ুয়াকে ঘন ঘন স্কচ নিতে দেখেছিলেন।

ইডেন গার্ডেনের পশ্চিম গেটটার সামনে গাড়িটা থেমে গেল। জ্ঞানব্রতকে অন্যমনস্ক দেখে ড্রাইভার শুধু বললো, স্যার—।

সময় কাটাবার জন্য ইডেন গার্ডেনে তিনি ঘুরে বেড়াবেন ? সেটা হাস্যকর। ওখানে অল্প বয়েসী ছেলে মেয়েরা যায়। অন্তত পঁচিশ বছরের মধ্যে জ্ঞানব্রত ইডেন গার্ডেনের এই দিকটায় সন্ধ্যেবেলা একবারও আসেনি। ক্রিকেটের সময় দুপুরে আসতেন বটে, তাও সারা দিনের পুরো খেলা কোনোবারই দেখা হয় নি।

তার চেয়ে গঙ্গার ধারে খানিকক্ষণ হেঁটে বেড়ালে হয়। শীতের বেলা, এরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে। জ্ঞানব্রতর মনে পড়লো অনেকদিন তিনি কোনো নদী দেখেন নি।

ড্রাইভারকে বললেন তুমি এখানে থাকো। আমি আসছি।

স্ট্যাণ্ডের কাছটায় যে এমন সুন্দর সব ফুলের গন্ধ আর এরকম বাঁধানো রাস্তা হয়েছে জ্ঞানব্রত জানতেনই না। অনেকেই এখানে বেড়াতে আসে। এমন কি তার বয়সী লোকও রয়েছে।

আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে জ্ঞানব্রত আপন মনে গুনগুন করে সেই গানটা গাইতে লাগলেন :

শহরে ষোলোজন বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা
সব লুটে...

এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবলেন, আমার কি মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেল ? এ কী গান আমি গাইছি ? এ গানটা সারা দিন আমার মাথায় গেঁথে আছে কেন ? এর মধ্যে কী যাদু আছে ? ট্রেনের ভিখিরি কিংবা বাউল-টাউলরা এরকম গান গায়, এর সঙ্গে গোল্ডেন ষ্টার টুথ পেষ্ট কোম্পানীর মালিকের কী সম্পর্ক !

একটু বিরক্ত মুখে তিনি গঙ্গার দিকে মুখ করে একটা গাছতলায় দাঁড়ালেন।

বড় বড় কয়েকটা জাহাজ আলোকমালায় সাজানো। ছোট ছোট অনেকগুলো নৌকা মোচার খোলার মতন দুলছে, এই মাত্র একটা স্টীমার জলে ঢেউ তুলে ভোঁ ভোঁ শব্দে ডেকে চলে গেল। এই গানটার সঙ্গে জ্ঞানব্রতর ছেলেবেলার কোন যোগ আছে নিশ্চয়ই। জ্ঞানব্রতর খুব ভালো মনে পড়ে না ছেলেবেলার কথা। চোদ্দ বছর তিন মাস বয়সে তার বাবা মারা যান। তারপর থেকে সব স্মৃতিই খুব স্পষ্ট, কিন্তু বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন তার আগের দিনগুলো যেন হারিয়ে গেছে একেবারে। অথচ সেই সবই ছিল সুখের দিন। বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে তাঁদের সংসারটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল একেবারে।

ঠিক সাড়ে সাতটার সময় জ্ঞানব্রতর গাড়ি থামলো ক্যালকাটা ক্লাবের সামনে।

এখনো তাঁর অন্যমনস্ক ভাবটা যায়নি। কোনো দিকে না তাকিয়ে উঠে যাচ্ছিলেন দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে, হঠাৎ প্রায় মুখোমুখি একজন দাঁড়িয়ে সোল্লাসে বললো, হ্যাল্লো জি! বি! সিয়িং ইউ আফটার আ লং টাইম! একা যে?

জ্ঞানব্রত মুখ তুলে একটি বেশ দীর্ঘকায় মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিকে দেখলেন। তার পাশে এক ছিপছিপে চেহারার তরুণী মেয়ে। পুরুষটিকে চেনেন জ্ঞানব্রত, কনসালটেন্সি ফার্ম আছে। জ্ঞানব্রত ব্যবসা শুরু করার পর গোড়ার দিকে কিছুদিন এর সাহায্য নিয়েছিলেন, এখন বিশেষ যোগাযোগ নেই, তবে তিনি শুনতে পান বাজারে এর অনেক টাকা ধার।

জ্ঞানব্রত ফিকে হাসির সঙ্গে বললেন, কী খবর, পি, সি ?

—খবর তো অনেক। আমরা চলে যাচ্ছিলুম···চলুন তাহলে আপনার সঙ্গে আর একটু বসি। জি. বি, আপনি খানিকটা রিডিউস করেছেন মনে হচ্ছে। ইউ লুক ইয়াং।

উঁচু মহলে কেউ কারুর নাম ধরে ডাকে না। নামের ইংরাজী দু'টি আদ্যক্ষর বলাই রেওয়াজ। জি. বি, পি. সি, আর. এন, পি. কে। যেন মানুষ নয়, কোনো গুপ্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

জ্ঞানব্রত বুঝতে পারলেন, পি. সি নামের লোকটি এরই মধ্যে বেশ খানিকটা নেশা করেছে। ওর সঙ্গে টেবিলে বসে কথা বলার একটুও ইচ্ছে নেই তাঁর। কিন্তু লোকটি নিজেই নিজেকে নেমন্তন্ন করেছে।

জ্ঞানব্রত বললেন, আমার সঙ্গে একজনের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।

অকারণেই হা হা করে হেসে উঠে পি. সি বললো, কোনো গোপন ব্যাপার ? কোনো পরস্ত্রী ? আমরা সেখানে থাকলে অপরাধ হবে ?

তারপর হঠাৎ মনে-পড়া ভঙ্গিতে পি. সি তার পাশের মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, আলাপ করিয়ে দিই, মীট্ মাই কাজিন, এলা। এই মেয়েটির নাম এলা···ইয়ে—মানে—কী যেন পদবী তোমার, কিছুতেই মনে থাকে না।

মেয়েটি বললো, মুখার্জি। এলা মুখার্জি।

পি. সি. নামের লোকটি তার এমনই কাজিনকে সঙ্গে এনেছে, যার পদবীও সে জানে না। আজকাল এরকম কাজে মিথ্যে কথা বলার দরকার হয় না। ঐ পি. সি. যে-কোনো মেয়ের সঙ্গেই ক্যালকাটা ক্লাবে এসে থাক না কেন, তাতে জ্ঞানব্রতর কি আসে যায় ?

তলা থেকে আরও লোক আসছে, এই সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। জ্ঞানব্রত ওপরে উঠতে শুরু করতেই পি. সি. আর এলা মুখার্জি এলো সঙ্গে সঙ্গে।

কোণের একটা টেবিলে বসবার পর পি. সি. জ্ঞানব্রতকে বললো, আই উইল হ্যাভ ওয়ান স্কচ অন ইউ। এলা কী খাবে আপনি জিজ্ঞেস করুন। ইউ ক্যান অফার হার হোয়াট এভার ইউ লাইক।

এলা বললো, সে আগে জিন আর লাইম খেয়েছে, এখনও তা-ই খাবে।

বয়কে ডেকে মৃদুকণ্ঠে হুইস্কি, জিন এবং নিজের জন্য মিনারাল ওয়াটার অর্ডার দিলেন জ্ঞানব্রত।

এলার কাঁধে আলগা হাত রেখে পি. সি. বললো, জানো তো এলা, এই জি. বি, নাও আ ভেরি বীগ্ ম্যান—কিন্তু এক সময় ছিল, আমার কাছে আসতে হতো, আমি ব্যাঙ্ক লোন পাইয়ে দিয়েছি। জী. বি. দিই নি? ঠিক বলছি?

পি. সি'র উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট। এক সময় সে জ্ঞানব্রতর উপকার করেছে। এখন তার প্রতিদান চায়। দু'চার পেগ স্কচ্ খাওয়াবে, এ আর এমন কী! কিন্তু এরকম প্রতিদান যে সে অনেকবার নিয়েছে, তা এলা জানে না।

জ্ঞানব্রত কৃপণ নন্, পি. সি-কে খাওয়াতে তাঁর আপত্তি নেই। তা ছাড়া এই সব খরচই যাবে তাঁর এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট থেকে। কিন্তু তিনি জানেন, একবার নেশা হয়ে গেলে, পি. সি. আর থামতেই চাইবে না।

এলা মেয়েটি খুবই সুশ্রী। মুখে বুদ্ধির আভা আছে। পি. সি'র

সঙ্গে তার বয়েসের অনেক তফাৎ,, অন্তত তিরিশ বছর তো হবেই। এইসব মেয়েকে মদ্যপানের সঙ্গিনী হিসেবে পি সি. জোগাড় করে কী ভাবে ? আর এই সব মেয়েরাই বা আসে কেন ?

এলা নিজের হাতব্যাগ থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বার করলো। দু'টিই বেশ দামী। তারপর জ্ঞানব্রতর দিকে তাকিয়ে একটু লাজুকভাবে জিজ্ঞেস করলো, আমি আপনার সামনে সিগারেট খেতে পারি ?

জ্ঞানব্রত অবাক না হয়ে পারলেন না। তাঁর সামনে মদ খেতে পারে, অথচ সিগারেট ধরাতে লজ্জা, এ আবার কী ধরনের মেয়ে ?

জ্ঞানব্রত কিছু বলবার আগেই পি সি বলে উঠলো, আরে খাও, খাও! জি বি কিছু মনে করবে না। বছরে দু'তিনবার লণ্ডন আমেরিকা যায়। এলা বললো, না আমি ওকে আগে থেকেই চিনি কিনা।

—আপনি আমাকে চেনেন ?

—আমাকে 'আপনি' বলছেন কেন ? পি সি. আবার মাঝখানে বলে উঠলো ওকে 'আপনি' বলার কী আছে ? জি. বি, ইউ আর সো ফরমাল···

জ্ঞানব্রতর মনে হলো, এখানে এখন পি সি. না থাকলেই ভালো হতো। এলা নামের এই মেয়েটির সঙ্গে তাঁর কথা বলতে ভালো লাগতো। এক একটি মেয়ে থাকে, যাদের মুখের দিকে তাকালেই ভালো লাগে, এলা সেই রকম।

—তুমি আমায় আগে থেকে চেনো ?

—হ্যাঁ, একবার দেখেছি। আপনি তো উজ্জয়িনীর বাবা!

উজ্জয়িনীর সঙ্গে আমি ব্রেবোর্ণে পড়েছি এক বছর। তখন একবার আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলাম।

জ্ঞানব্রত স্পষ্ট টের পেলেন, তাঁর শরীরটায় ঝনঝন শব্দ হলো। এই মেয়েটি তাঁর মেয়ে উজ্জয়িনীর সহপাঠিনী?' পি. সি'র মতন একজন সন্দেহজনক চরিত্রের লোকের সঙ্গে ঘোরে। তাঁর সামনে বসে মদ খাচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে তাঁর মেয়ের বান্ধবী, উজ্জয়িনীর কত বয়েস? কয়েক মাস আগেই ওর কুড়ি বছরের জন্মদিন গেল না? এই মেয়েটির বয়েসও তা হলে কুড়ি একুশ। তবে কি উজ্জয়িনীও অন্য কোথাও অন্য কারুর সঙ্গে এইভাবে···না না তা হতেই পারে না!

দু'এক মুহূর্ত আগে জ্ঞানব্রত ছিলেন পুরুষ মানুষ, এখন হয়ে গেলেন বাবা। তাঁর মেয়ের সম্পর্কে দুশ্চিন্তা হতে লাগলো, উজ্জয়িনী অনেক স্বাধীন হয়ে গেছে, যখন তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়··· জ্ঞানব্রত তেমন খবর রাখতে পারেন না।

এলা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললো, উজ্জয়িনী এখন এম. এ পড়বে না? আমি আর এম. এ-টা পড়লুম না!

তৎক্ষণাৎ সস্তা রসিকতার সুরে পি. সি বললো, তার বদলে প্রেমে পড়ে গেলে! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

জ্ঞানব্রত আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন। এলার দিকে তিনি আর তাকাতেও পারছেন না।

এলা বললো, কলেজে আমরা একবার 'তাসের দেশ' করেছিলুম, উজ্জয়িনী হরতনী সেজেছিল, আপনি দেখতে গিয়েছিলেন?

জ্ঞানব্রত দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

—আমি হরতনীর গান গেয়েছিলুম পেছন থেকে।

পি. সি. বললো, খুব ভালো গান গায়। জি. বি'র অবশ্য গানটান শোনার সময় নেই, মেকিং মানি অল দা টাইম—

গান কথাটা শোনামাত্র জ্ঞানব্রতর আবার মনে পড়লো সেই লাইনগুলো—শহরে যোলোজন বোম্বেটে—করিয়ে পাগলপারা—নিল তারা সব লুটে—।

পি. সি. বললো, বাংলা সিনেমায়, রেডিওতে আজকাল যা বাজে বাজে গান হয়, সেই তুলনায় এলা···শি ইজ আ ওয়াণ্ডার···এমন চমৎকার গলা?

—চুপ করো! তুমি বড় বাড়িয়ে বলছো।

জ্ঞানব্রত মুখ তুলে তাকালেন। এলা তুমি বলে কথা বলে পি. সি'র সঙ্গে। এই মেয়েটির পশ্চাৎপটটা তিনি ঠিক ধরতে পারছেন না। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাসও তাঁর নেই।

পি. সি'র গেলাস খালি হয়ে গেছে। বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই সে বললো, হ্যাঁ দাও, আর একটা!

এলা আর নিতে চাইলো না। সে বললো, আমি এবার উঠবো। তা ছাড়া উনি কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন, আমরা শুধু শুধু ডিসটার্ব করছি ওঁকে—

এক্ষেত্রে ভদ্রতা করে জ্ঞানব্রতর বলা উচিত, না, না, সে রকম কোনো ব্যাপার নয় ইত্যাদি। কিন্তু সে সুযোগও তিনি পেলেন না, তার আগেই পি. সি বলে উঠলো, আরে যাঃ। জি. বি-কে কি আমি আজ থেকে চিনি? কতকালের সম্পর্ক! সার্টেইনলি হি ওণ্ট মাইণ্ড···তোমার মত একজন সুন্দরী মেয়েকে দেখেও বিরক্ত হবে, কী, জি. বি?

জ্ঞানব্রত বললেন, মাই প্লেজার!

পরের গেলাসে চুমুক দিয়েই পি. সি বললো, আমি একটু আসছি। তারপর সে বেরিয়ে গেল।

এবার জ্ঞানব্রত আর এলা মুখোমুখি। জ্ঞানব্রত অশ্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না।

—আপনাকে দেখলে কিন্তু বোঝা যায় না।

জ্ঞানব্রত একটু চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কি?

—আপনার মাথায় এত চুল, একটাও পাকে নি।

—ও, বয়েস!

—এখনো খুব ইয়াং আছেন!

এলার হাসিটা দেখে আরও চমকে উঠলেন জ্ঞানব্রত। কম বয়েসী মেয়েদের সঙ্গে তেমন মেলামেশার অভ্যেস না থাকলেও এ হাসি দেখলে চিনতে ভুল হয় না। প্রশ্রয়ের হাসি। পি. সি'র অনুপস্থিতিতে এলা তাঁকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করছে। তাঁর নিজের সমবয়েসী একটি মেয়ে ···

জি ই সি কোম্পানির চৌধুরী এই সময় বার-রুমে ঢুকে জ্ঞানব্রতকে দেখে কথা বলার জন্য এগিয়ে এসে থমকে গেলেন হঠাৎ। তারপর দ্রুত চলে গেলেন উনি। এরকম ভর সন্ধ্যেবেলা ক্যালকাটা ক্লাবে কোনো যুবতী মেয়েকে নিয়ে মদের টেবিলে বসে থাকবেন জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী, এ রকম যেন কেউ কল্পনাই করতে পারে না।

জ্ঞানব্রত মনে মনে একটু হাসলেন। চৌধুরী বোধহয় ভাবলেন, হঠাৎ রাতারাতি তার চরিত্র পালটে গেছে।

কী মুস্কিল, পি সি আসছে না কেন ? বাথরুম করতে এত দেরী হয় ? নিশ্চয়ই আর কারুর সঙ্গে গল্পে মেতে গেছে।

কতক্ষণ আর চুপচাপ বসে থাকা যায়, তাই জ্ঞানব্রত কথার কথা হিসেবে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় থাকো ?

—গোল পার্কে। ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলে।

—হোস্টেলে ? তুমি চাকরী করো ?

—করতাম। এখন করি না।

পর মুহূর্তেই এলা ঝরঝর করে হেসে বললো ভয় নেই, আপনার কাছে চাকরি চাইবো না। আমার গান বাজনা নিয়ে থাকার ইচ্ছে। আপনি গান ভালোবাসেন না ?

—খুব যে ভালোবাসি কিংবা বুঝি, তা বলতে পারি না। তবে মাঝে মাঝে শুনি।

—সামনের সপ্তাহ থেকে যে হাফেজ আলীর নামে কনফারেন্স হচ্ছে, তাতে যাবেন ? আমি যেতে পারি আপনার সঙ্গে।

একটু গম্ভীর হয়ে জ্ঞানব্রত বললেন, সামনের সপ্তাহে আমার কলকাতায় থাকা হবে না। বোম্বে যেতেই হবে।

—বাবা ! আপনারা সব সময় এত ব্যস্ত !

—তুমি কী গান করো ? পল্লীগীতি কিংবা পুরানো বাংলাগান জানো ?

—ফোক সঙ্ ? না ওসব আমি করি না···আমি নজরুল-অতুল প্রসাদের গান···রবীন্দ্র সঙ্গীতও শিখেছি। কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতের এত আর্টিষ্ট যে চান্স পাওয়া যায় না।

এবার রেডিও ষ্টেশনের বড়ুয়া দরজা দিয়ে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। জ্ঞানব্রত হাত তুললেন।

বড়ুয়া এলার দিকেই তাকাতে তাকাতে এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বসলেন। বড়ুয়া ও জ্ঞানব্রত প্রায় সমবয়েসীই মনে হয়, মাথার চুলে কিছু পাক ধরেছে। কিন্তু জ্ঞানব্রতর তুলনায় বড়ুয়া অনেকটা ছটফটে ধরনের মানুষ। এদের- আদি বাড়ি চট্টগ্রামে, তবে এখন নিজেকে অসমীয়া বলে পরিচয় দেন।

পাক্কা সাহেবের মতন সুট-টাই পরা বড়ুয়ার। বসেই কোটের দু'পকেট থাবড়াতে থাবড়াতে বললেন, আই অ্যাম স্লাইটলি লেট— আটটা দশ—এই যাঃ। সিগারেট আনতে ভুলে গেলাম!

টেবিলের ওপর এলার সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার পড়ে আছে। বড়ুয়া ধরেই নিলেন সেগুলো জ্ঞানব্রতর। তিনি সেদিকে অন্যমনস্কভাবে হাত বাড়াতেই জ্ঞানব্রত বললেন, আমি সিগারেট আনিয়ে দিচ্ছি, আপনার কী ব্র্যাণ্ড?

এলা বললো, নিন না।

এবার আলাপ করিয়ে দিতে হয়। জ্ঞানব্রত বললেন, ইনি মিস এলা মুখার্জি, গান করেন, আর ইনি এন সি বড়ুয়া কলকাতা রেডিওর···

বড়ুয়ার চোখে বেশ খানিকটা কৌতূহল ফুটে উঠলো। তিনি একবার এলার মুখের দিকে, একবার জ্ঞানব্রতর দিকে তাকাতে লাগলেন। ব্যাপারটা ধরতে পারছেন না।

এরকম অদ্ভুত অবস্থায় জ্ঞানব্রত কখনো পড়েন নি। ঝোকের মাথায় বড়ুয়াকে তিনি এখানে ডেকেছিলেন। বড়ুয়া নিশ্চয়ই একটা কিছু কারণ জানতে চাইবেন। অন্তত মনে মনে। কিন্তু কী কারণ দেখাবেন জ্ঞানব্রত? যা বলতে চান তাও এখন বলা যাবে না। এলাকে নিয়ে তিনি বসে আছেন। এলা গান গায়। বড়ুয়া হয়তো

ভাববেন এই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যই তাঁকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মেয়েটিকে যে জ্ঞানব্রত পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগেও চিনতেন না। তা কি বিশ্বাস করবেন ?

এরপরই এসে পড়লো পি সি।

জ্ঞানব্রত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বলা হবে না, কোন কথাই বলা হবে না আজ। অনাবশ্যক অন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছেন।

তাঁর ইচ্ছে হলো, কারুকে কিছু না বলে হঠাৎ এখান থেকে উঠে চলে যেতে।

সে রাতে জ্ঞানব্রত বাড়ি ফিরলেন এগারোটারও পর, এবং বেশ মাতাল অবস্থায়। এটা একটা অভিনব ঘটনা।

সুজাতা অবাক হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিলিতি শিক্ষা অনুযায়ী মুখে সে ভাব ফোটালো না। কোনো এক ইংরেজ মহিলা ঔপন্যাসিকের লেখায় সুজাতা পড়েছিল যে, যারা প্রকৃত লেডী, তারা কোন কিছুতেই চট্ করে অবাক হয় না।

কেন দেরী হলো, কাদের সঙ্গে ছিল এসব কিছুই জিজ্ঞেস করলো না সুজাতা। শুধু জানতে চাইলো, তুমি কি রাত্রে আর কিছু খাবে ?

জ্ঞানব্রতর চক্ষু দুটি লাল, চুল এলোমেলো, টাইয়ের গিট আলগা। সারা মুখে একটা জ্বলজ্বলে ভাব। মাথা নেড়ে বললেন, না।

স্বামী স্ত্রীর একই শয়ন কক্ষ বটে কিন্তু আলাদা দু'টি খাট। ঘরটি বেশ বড়। খাট দু'টি দু'দিকের দেয়ালে পাতা। এই ব্যবস্থা এই জন্য যে সুজাতা অনেক রাত জেগে উপন্যাস পড়তে ভালোবাসে। জ্ঞানব্রত ঘুমিয়ে পড়েন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায় এবং চোখে

আলো তাঁর সহ্য হয় না। সুজাতার খাটের সঙ্গে একটা ছোট্ট আলো লাগানো আছে বই পড়বার জন্য।

সুজাতা বললো, তুমি অ্যাসপিরিন বা অ্যাণ্টাসিড জাতীয় কিছু ওষুধ খাবে ?

জ্ঞানব্রত প্রথমে ছু'দিকে ঘাড় নাড়লেন। তারপর এক মুখ হেসে শিশুর মতন আবদারের গলায় বললেন, একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। দেবে ?

এতেও বিস্মিত ভাব দেখালেন না সুজাতা।

আজ এরকম পরপর নিয়মের ব্যতিক্রম করছেন জ্ঞানব্রত।

এক সময় তাঁর মুখে সিগারেট কিংবা চুরুট সব সময় লেগে থাকতো। সাত মাস আগে একদিন বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার অবশ্য অনেক পরীক্ষা করেও হার্টের কোনো রোগ ধরতে পারেন নি। তবে সাবধান হওয়া ভালো। সিগারেট, চুরুট এসব ছাড়া দরকার।

সিগারেটের অভ্যেস ছাড়া পৃথিবীর বহু লোকের পক্ষে খুব শক্ত হলেও জ্ঞানব্রতর কাছে কিছুই না। সেই যে চুরুটের বাক্স ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রাস্তায়, তারপর থেকে এই সাত মাসের মধ্যে একবারও ভুলেও ধূমপানের ইচ্ছে প্রকাশ করেন নি। তাঁর যেমন কথা, তেমন কাজ।

এক সময় মুখে ছুটো সিগারেট এক সঙ্গে নিয়ে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে জ্ঞানব্রত তার একটা দিতেন সুজাতাকে। বিয়ের পর কিছুদিন রাত জেগে গল্প করার সময় ছু'জনে পাশাপাশি বসে এক প্যাকেট সিগারেট উড়িয়ে দিতেন।

সুজাতা সিগারেটের অভ্যেস ছাড়তে পারে নি।

স্বামীর দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আই থিংক, ইউ বেটার নট।

—খাই না একটা!

আগেকার মতন আর এক সঙ্গে দুটো সিগারেট জ্বালালেন না জ্ঞানব্রত। শুধু নিজেরটা ধরিয়ে বললেন, আজ একটা বড় মজার ব্যাপার হয়েছে। একটা গানের কটা লাইন এমন মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে যে কিছুতেই তাড়াতে পারছি না। এমন কি এতখানি মদ গিলে ফেললুম, তাও যাচ্ছে না!

—কী গান?

একটা হেঁচকি উঠতেই প্রথমে মুখে হাতচাপা দিয়ে জ্ঞানব্রত বললেন, সরি। তারপর উঁ উঁ করে সুর ভেঁজে গেয়ে উঠলেন:

শহরে ষোলোজন বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে—
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি,
চোরেরও সে শিরোমণি

এমনিতেই জ্ঞানব্রতর গলায খুব একটা সুর নেই, মাতাল অবস্থায় তার গলাটা আরও মজার শোনাচ্ছে।

সুজাতা হেসে ফেলে বললো, বাঃ বেশ গানটা তো!

—পরের লাইনগুলো মনে পড়ছে না।

—এটা কার গান?

—কী জানি! আমি কি গান বাজনার কোনো খবর রাখি? তবু এই একটা অদ্ভুত গান যে কেন মাথায় ঢুকে গেল··

—এবার শুয়ে পড়ো, ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

জ্ঞানব্রত ধড়াচুড়ো ছেড়ে রাত্রের শোবার পোশাক পরতে লাগলেন। যথেষ্টই নেশা হয়েছে। মাঝে মাঝে তাঁর পা কেঁপে যাচ্ছে।

—আচ্ছা সুজাতা তুমি এই গানটা আগে কখনো শুনেছো?

—না!

অথচ আমার মন বলে আমি আগে এটা অনেকবার শুনেছি। তা কী করে সম্ভব?

সুজাতার খাটের ওপর একটা বই অর্ধেক উল্টোনো। বেলজিয়ান লেখক জর্জ সিমেনো'র সে নিদারুণ ভক্ত। গোয়েন্দা উপন্যাসের অর্ধেকটা যার পড়া হয়েছে, তার কেন সেই সময় একটা আজেবাজে গান সম্পর্কে আলোচনা শুনতে ভালো লাগবে?

—তুমি শুয়ে পড়ো, আমি আসছি! সুজাতা চলে গেল বাথরুমে।

টুথপেষ্ট কোম্পানি মালিকের স্ত্রী বলেই নয়, রাত্রে শোবার আগে দাঁত ব্রাস করা সুজাতার ছেলেবেলা থেকেই অভ্যেস। টুথপেষ্ট কোম্পানির মালিক স্বয়ং অবশ্য রাত্রে দাঁত মাজেন না। শুধু তাই নয়, দাঁত মাজার পর টুথ পেষ্টের গন্ধমাখা মুখে চুমু খেতেও তাঁর ভালো লাগে না। সুজাতা তার স্বামীর ভাবভঙ্গি দেখে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে আজ আর তাঁর চুমু খাওয়ার কোনো বাসনা নেই।

সুজাতা ফিরে এসে দেখলো জ্ঞানব্রত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন জানলার কাছে।

—প্রায় বারোটা বাজলো, তুমি ঘুমোবে না?

—হ্যাঁ, এবার শুচ্ছি। অনেক দিন কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় নি। চলো এবার কোনো গ্রামে বেড়াতে যাই। যাবে?

—তুমি যে বলেছিলে সামনের দু' তিন মাসে তোমার খুব বেশী কাজ ? হায়দ্রাবাদে একটা ফ্যাকট্রি খোলা হবে ···

—হ্যাঁ, কাজ আছে তো বটেই....কিন্তু মন টানছে এমন কোথাও যাই, যেখানে সবুজ গাছপালা, একটা বেশ নির্জন নদী।

সুজাতার কাছে গ্রাম মানে ট্রেনের দু'ধারের দৃশ্য। শান্তিনিকেতনের চেয়ে কোনো ছোট জায়গায় সে জীবনে থাকে নি। সাদা টালি বসানো বাথরুম যেখানে নেই, সে সব জায়গা সুজাতার পক্ষে বাসযোগ্যই নয়। সুজাতার রূপ এবং সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যেই এই ভাবটা রয়েছে যে, এই পৃথিবীতে সে অবিমিশ্র সুখ ভোগের জন্যই এসেছে।

কেনই বা সুখ ভোগ করবে না। একটাই তো জীবন ?

—তুমি যদি সময় করতে পারো, চলো তা হলে একবার শান্তিনিকেতন থেকে ঘুরে আসি। চুম্‌কিও বলছিল ··

—আগেরবার শান্তিনিকেতন গিয়ে তোমার ভালো লাগে নি।

—যা গরম ছিল সেবার। টুরিষ্ট লজের যে ঘরটা আমাদের দিয়েছিল, এয়ারকুলারটা কোন কাজ করছিল না।

—হা-হা-হা-হা।

জ্ঞানব্রত কাছে এগিয়ে এসে সুজাতাকে জড়িয়ে ধরলেন। সুজাতা মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতেই তিনি বললেন, না, না, ভয় নেই, চুমু খাবো না, তুমি কি সুন্দর, সুজাতা ! তুমি স্বর্গের মানুষ। এই পৃথিবীর নও ; গুড নাইট !

নিজের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লেও তক্ষুণি ঘুম এলো না জ্ঞানব্রতর। ক্যালকাটা ক্লাবের সন্ধ্যেটার কথা মনে পড়তে লাগলো। এলা নামের মেয়েটি কী অদ্ভুত ! তার মেয়ের প্রায় সমান। চুমকির সঙ্গে একসঙ্গে

পড়েছে। সেই মেয়ে ক্যালকাটা ক্লাবে গিয়ে মদ খায় শুধু না, স্পষ্ট তাকে সিডিউল করার চেষ্টা করেছে। চকচকে স্থির দৃষ্টি মেলে ঠোঁটটা কাঁপাচ্ছিল।

এলার ব্যাপারটা সুজাতাকে বলা হয়নি বলে জ্ঞানব্রত একটু অপরাধীবোধ করছেন। স্ত্রীর কাছে কোন কিছু লুকানো তাঁর স্বভাব নয়। তাঁর কোনো গোপন জীবন নেই। থাক, পরে বললেও চলবে।

মাঝরাতে ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসলেন জ্ঞানব্রত। তিনি একটা স্বপ্ন দেখছিলেন। এখনো স্বপ্নের ঘোর কাটেনি। তারপর ভালো করে চোখ মেলে দেখলেন সুজাতার খাটে তখনও আলো জ্বলছে, আর কয়েক পৃষ্ঠা বাকি বইটার। সুজাতা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছে।

জ্ঞানব্রত বললেন, লালন ফকির ?

শব্দ শুনে এদিকে তাকিয়ে সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার উঠলে যে, জল খাবে ?

জ্ঞানব্রত বললেন, এবার মনে পড়েছে। ওটা লালন ফকিরের গান।

এবার সুজাতা অবাক না হয়ে পারলো না। সামান্য একটু ভুরু তুলে বললো, তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঐ গানটার কথা ভাবছো ?

—হ্যাঁ, একটি স্বপ্ন দেখলুম—ছেলেবেলায় এই গানটা আমি প্রায়ই শুনতুম এক বুড়োর মুখে···আমি জানি এটা লালন ফকিরের গান···

সুজাতা অনেকগুলো বছর বিদেশে কাটিয়েছে। বাংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে তার বিশেষ কোন জ্ঞান নেই। তবে ক্যাসান অনুযায়ী সে রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে উপযুক্ত আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সত্যজিৎ

রায়ের প্রতিটি ফিল্ম দেখে। লালন ফকিরের নামও সে শোনে নি। কখনো কোথাও শুনে থাকলেও তার মনে ঐ নাম কোনো রেখাপাত করে না।

কোনো কথা না বলে সুজাতা অপেক্ষা করে রইলো। হলোই বা একটা বিদঘুটে, গেঁয়ো গান লালন ফকির নামে কোনো একজনের লেখা বা সুর দেওয়া, কিন্তু তাই নিয়ে মাঝ রাতে ঘুম ছেড়ে আলোচনা করতে হবে? এটা তো ঠিক স্বাভাবিক ব্যবহার নয়। জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জি তো কখনো এরকম করেন না।

—আমি বাজি ফেলে বলতে পারি এটা লালন ফকিরের গান!

—তুমি কার সঙ্গে বাজি ধরতে চাইছো?

এতক্ষণে পুরোপুরি ঘোর কাটলো। সত্যিই তো, তিনি প্রায় পাগলের মতন ব্যবহার করছেন।

উঃ হোঃ! তোমায় ডিস্টার্ব করলুম। কত রাত হলো, তুমি এখনো ঘুমোও নি?

—আমি আর তিন চার পাতা শেষ করবো।

আর আধ ঘণ্টা পরে একই ঘরের দু'টি খাটে দু'জন নারী পুরুষ দু'রকম দু'টি স্বপ্ন দেখলো। একজন প্যারিসের মমাত অঞ্চলের, যেখানে ইন্সপেক্টর মেইগ্রে এই মাত্র এক কোটিপতি বাউণ্ডুলেকে স্ত্রী হত্যার দায়ে গ্রেফতার করলেন। আর একজন দেখলো বাংলার এক অতি সাধারণ পাড়াগাঁর। সেখানে দু'তিনটি শিশু লুকোচুরি খেলছে এক আম-বাগানে।

পরদিন সকালে ঠিক সেই ছটাতেই ঘুম ভাঙলো জ্ঞানব্রতর। রুটিন মেলানো প্রত্যেকটি কাজ করে যেতে লাগলো। তবু মনের মধ্যে

একটা অস্থির অস্থির ভাব। খেতে বসবার আগে সাতটি টেলিফোন এবং তিনজন দর্শন প্রার্থীর সঙ্গে কাজের কথা বলতে হলো তাঁকে তব্‌ সেই ছটপটানিটা গেল না।

খাবার টেবিলে সুজাতা ঘুম ভেঙে উঠেই ছুটে এলো যথারীতি। উজ্জয়িনীও আজ এই সময় ব্রেক ফাষ্ট খেতে টেবিলে এসে বসেছে। মেয়েকে আজ একটু বেশী করে লক্ষ্য করতে লাগলেন জ্ঞানব্রত।

এই উজ্জয়িনীরই সহপাঠিনী এলা। উজ্জয়িনী বলেছে রবিবারে ব্যাণ্ডেলে পিকনিক করতে যাবে বন্ধুদের সঙ্গে। সত্যি ব্যাণ্ডেলে যাবে, না কোনো হোটেলে গিয়ে মদ খাবে, পুরুষ মানুষ সম্পর্কে ওর কি এর মধ্যেই অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে ? না, না, সব মেয়ে এক রকম হতে পারে না।

—তুই এলা নামে কারুকে চিনিস ?

মা আর মেয়ে দু'জনেই অবাক হলো। সুজাতার মুখে অবশ্‌ তার কোনো রেশ নেই, কিন্তু উজ্জয়িনী তো এখনো ঠিক লেডী হয় নি তাই সে বেশ চমকে গেল। তার বাবার মুখ থেকে এই ধরনের প্রশ্‌ সে এই প্রথম শুনলো।

—এলা ? কোন এলা ?

—সরকার না চ্যাটার্জি কী যেন বললো পদবীটা ঠিক মনে নেই। তোর সঙ্গে ব্রেবোর্ণে কোনো এক বছরে পড়েছে।

—এলা কে ? না তো। ঐ নামে তো কাউকে মনে করতে পারছি না। ভালো নাম কী ?

—এটাই নিশ্চয়ই ভালো নাম, আমাকে শুধু ডাক নাম বলে কেন ? বললো যে একবার নাকি আমাদের এ বাড়িতেও এসেছে ?

—তুমি তাকে কোথায় দেখলে ?

—ক্যালকাটা ক্লাবে ··আমার একজন চেনা লোকের কাজিন হয় বললো। আমাকে আগে দেখেছে, তোর খুব চেনা।

আমাকে—ও, এলা। হ্যাঁ, এবার বুঝতে পেরেছি, মোটে এক বছর পড়েছিল, তারপর তো অনেকদিন আর দেখি নি।

—তোরা ব্যাণ্ডেল যাচ্ছিস এই রোববার ?

—হ্যাঁ। বাবা, তোমার গাড়িটা দেবে সেদিন ?

—ক'জন যাবি ? ইচ্ছে করলে কারখানার একটা ষ্টেশন ওয়াগন নিতে পারিস।

—আমরা ছ'জন। অ্যামবাসডরেই হয়ে যাবে।

—ড্রাইভার চাই ? না, তোর বন্ধুদেরই কেউ চালাবে ?

সুজাতা বললো, না, না, ওরা বড্ড জোরে চালায় ··· ··জ্ঞান সিং থাকুক ওদের সঙ্গে ··

উজ্জয়িনী একবার তাকালো মায়ের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, মা ! তুমি কেমন আস্তে গাড়ি চালাও ?

একথা ঠিক সুজাতার হাতে ষ্টিয়ারিং পড়লে আর রক্ষা নেই। ইউরোপের ট্রাফিক আর কলকাতার ট্রাফিক যে এক নয়, সে কথা তার মনে থাকে না। দু'বার ছোট-খাটো অ্যাকসিডেণ্ট করেছে, তবু সুজাতা কম স্পীডে গাড়ি চালাতে পারে না।

সুজাতা বললো, আমি তো ঐজন্যই এখন গাড়ি চালানো ছেড়ে দিয়েছি।

জ্ঞানব্রত বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া শেষ করলেন। নিজের মেয়ে সম্পর্কে তিনি মিথ্যে সন্দেহ করছিলেন। চুমকির মুখটা কত সরল,

মোটেই ও এলার মত নয়। বাড়ির গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুদের সঙ্গে নির্দোষ পিকনিকে।

কারখানা থেকে অফিসে আসবার পর তিনি রেডিও ষ্টেশনে ফোন করলেন। মিঃ বড়ুয়া, আমি জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী। আজ আবার আপনাকে একটু ডিসটার্ব করছি।

—মিঃ চ্যাটার্জী? বলুন, বলুন লাষ্ট ইভনিং ওয়াজ ওয়াণ্ডারফুল। খুব জমেছিল—ঐ মেয়েটি আজ সকালে দেখা করতে এসেছিল আমার কাছে।

—কোন মেয়েটি!

—ঐ যে এলা সরকার রেডিওতে চান্স চায়—আপনার রেফারেন্সে এসেছে যখন, একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতেই হবে।

জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী মাঝপথে বাধা দিতে গেলেও বড়ুয়া সাহেব থামলেন না।

—জানেনই তো মিঃ চ্যাটার্জী আমাদের এখানে কিছুকিছু ফর্মালিটি তো আছেই, আমি নিজে গানটান খুব একটা বুঝি না. ওকে একবার অডিশান দিতে হবে—আমাদের একটা মিউজিক বোর্ড আছে—তবে হয়ে যাবে, ওর ঠিক হয়ে যাবে, দেখলেই বোঝা যায় ট্যালেণ্টেড, আপনি নিশ্চিত থাকুন, এজন্য আর ফোন করবার দরকার ছিল না।

জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী বলতে চাইলেন যে তিনি এলা নামের ঐ মেয়েটিকে মোটেই পাঠান নি। এবং তার জন্য ফোনও করছেন না। মেয়েটা দারুন কেরিয়ারিষ্ট তো! কালকের আলাপের সুযোগ নিয়ে আজ সকলেই বড়ুয়ার সঙ্গে দেখা করেছে!

কিন্তু এসব কথা তিনি টেলিফোনে বললেন না। এলা মেয়েটিকে তিনি পাঠান নি ঠিকই। তবে ঐ মেয়েটি যদি এইভাবে রেডিওতে গান গাইবার সুযোগ পায় তাতে তিনি বাধাই বা দেবেন কেন? যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন ও যা পারে করুক।

—মিঃ বড়ুয়া, আমি ফোন করছি আরও একটা কারণে··কাল সন্ধ্যেবেলা এই কথাটা আপনাকে জিজ্ঞেস করবো ভেবেই—শেষ পর্যন্ত আর বলাই হলো না—হয়তো আপনি মনে করবেন খুবই পিকিউ-লিয়ার রিকোয়েষ্ট।

—কী ব্যাপার? আপনি এত হেজিটেট করছেন কেন?

—এটা আমার বাতিকও বলতে পারেন। কাল সকাল দশটা আন্দাজ, না ঠিক দশটাই হবে। একজন একটা পল্লীগীতি গাইছিল। সেই গায়কের নামটা আমি জানতে চাই। বেতার জগতে নাম ছাপা নেই, আমি এক কপি বেতার জগত কিনে দেখলুম আজ।

—কোন চ্যানেলে!

—মানে!

—শর্ট ওয়েভে? বিবিধ ভারতী?

—তা জানি না। ইন ফ্যাক্ট রেডিও বাজছিল পাশের বাড়িতে গানের লাইনগুলো ছিল এই রকম:

শহরে ষোলো জন বোম্বেটে

করিয়ে পাগল পারা···

গানটি শুনে বড়ুয়া সাহেবও যে রীতিমতন অবাক হয়েছেন, তা টেলি-ফোনের এ পাশ থেকেও বোঝা যায়। তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করলেন কী গান? বোম্বাই? বোম্বাই শহরে। দাঁড়ান, দাঁড়ান, লিখে নিই।

তারপর তিনি বললেন, এই গানের গায়কের নাম আপনি জানতে চান ?

—হ্যাঁ। সম্ভব হলে তার বাড়ির ঠিকানাও।

···নো প্রবলেম। আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে আপনাকে রিং ব্যাক করে জানিয়ে দিচ্ছি।

এ দেশে যাদের নামের সঙ্গে সাহেব যুক্ত থাকে, তারা অন্তত একটা ব্যাপারে সাহেবদের মতন নন। তাঁদের পনেরো মিনিট মানে দেড় ঘণ্টা। দেড় ঘণ্টা বাদে বড়ুয়া সাহেব ফোন করে জানালেন যে ঐ গানের গায়ক একজন আনকোরা নতুন শিল্পী, তার নাম শশীকান্ত দাস। ঠিকানাটা এই···।

ঠিকানাটা কাগজে লিখতে লিখতে জ্ঞানব্রত জিজ্ঞেস করলেন, এই জায়গাটা কোথায় ?

বড়ুয়া সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, তা কী করে জানবো বলুন, উনিতো কখনো আমাকে ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নি ! কী ব্যাপার বলুন তো, আপনি এই লোকটিকে নিয়ে কী করবেন ?

—ওর কাছ থেকে গানটা শিখবো ! আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

বড়ুয়াকে আর কোনো কথা না বলতে দিয়ে জ্ঞানব্রত ফোন রেখে দিলেন।

আজ সারা পৃথিবীতে তাঁর যত কাজই থাক, তবু একবার এই শশীকান্ত দাসের সঙ্গে তাকে দেখা করতেই হবে।

রেডিও ষ্টেশনের পি, সি, বড়ুয়া যে ঠিকানাটি দিয়েছিলেন, সেই বাড়িটি খুঁজে বার করতে খুব বেশী অসুবিধে হলো না। বাগবাজারের কাছে একটা গলির মধ্যে মেসবাড়ি। এটা যে মেসবাড়ি, তা দরজা

দিয়ে ভেতরে এক পা বাড়ালেই টের পাওয়া যায়। এইসব বাড়িতেই একটা উগ্র পুরুষ পুরুষ গন্ধ থাকে।

অনেক কালের বাড়ি, সিঁড়িগুলো ক্ষয়ে যাওয়া, রেলিং নড়বড়ে। দোতলার বারান্দায় একটা তারে নানান রঙের লুঙ্গি শুকোচ্ছে।

জ্ঞানব্রত এসেছেন সন্ধ্যেবেলা, কিন্তু এখনো এ বাড়ির বাসিন্দারা সবাই ফিরে আসে নি। চুপচাপ, খালি খালি ভাব, সদর দরজাটা হাট করে খোলা, একতলাতে একজনও লোক নেই। জ্ঞানব্রত একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালেন, তারপর উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে।

মাঝপথে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হলো। লোকটির গায়ের রং মিশমিশে কালো, রোগা-লম্বাটে চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। লোকটি পরে আছে শুধু একটা গামছা।

তাকে এই মেসের কোনো ভৃত্য কিংবা রান্নার ঠাকুর মনে করে জ্ঞানব্রত জিজ্ঞেস করলো, ওহে, শশীকান্ত দাস কোন ঘরে থাকেন, বলতে পারো?

লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে গভীর বিস্ময়ে তাকালো জ্ঞানব্রতর দিকে।

তারপর আমতা আমতা করে বললো; আজ্ঞে···আমিই শশীকান্ত···।

জ্ঞানব্রত একটু হাসলেন। তিনি এমন কিছু অন্যায় করেন নি। এই ঘটনার আরও অনেক ক্লাসিক উদাহরণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে খালি গায়ে দেখে একজন আগন্তুক জিজ্ঞেস করেছিল, ওহে, বঙ্কিমবাবু বাড়ি আছেন কি না বলতে পারেন? বিদ্যাসাগর এবং মাইকেল

সম্পর্কেও এ রকম গল্প আছে। তবু বঙ্কিমবাবু ছিলেন সুপুরুষ। বিত্তাসাগর বা মাইকেলের তুলনায় এই লোকটিকে বেশ সুদর্শনই বলতে হবে। গায়ের রং কালো হলেও ছিপছিপে মেদবর্জিত শীরর। ভাল করে মেকাপ দিয়ে, মাথায় একটা পালকের মুকুট পরিয়ে দিলে অনায়াসেই যাত্রাদলের কেষ্ট ঠাকুর সাজানো যায়।

জ্ঞানব্রত বললেন, ও, আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।

লোকটির বিস্ময়ের ঘোর এখনো কাটেনি। জ্ঞানব্রতর চেহারায়, ব্যক্তিত্বে ও পোষাকে বেশ একটা সম্ভ্রান্ত ব্যাপার আছে। এই রকম মানুষ সচরাচর শশীকান্ত দাসের মতন লোকের কাছে যেচে দেখা করতে আসে না।

শশীকান্ত বললো, আজ্ঞে আমি তো আপনাকে স্যার ঠিক চিনতে পারলাম না ··· !

জ্ঞানব্রত বললেন, আগে তো আলাপ হয় নি, চিনবেন কী করে? আপনার সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে।

দরকারের কথা শুনে শশীকান্ত আরও বিভ্রান্ত। তার বুকের মধ্যে একই সঙ্গে দারুন বিপদের ভয় কিংবা দারুন কোনো সুসংবাদের আনন্দের জোয়ার-ভাটা চলছে।

—আমার সঙ্গে স্যার আপনার দরকার ··বলুন স্যার।

জ্ঞানব্রতর হাব ভাব খুব বেশী সাহেবী ধরনের। বছরে দু'তিনবার তাঁকে ইউরোপ-আমেরিকা যেতে হয়। তিনি লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময় মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে রাখেন, কখনো একটু কাশতে হলে মুখের সামনে হাত চাপা দেন। প্রকাশ্যে কোনোদিন তিনি

হাই তোলেন নি কিংবা হেঁচে ফেলেন নি। খাওয়ার পর ঢেকুর তোলা তার কাছে অসভ্যতার পরাকাষ্ঠা।

সেই রকমই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কাজের কথা বলাও তাঁর পক্ষে একটা চরম অভদ্রতার ব্যাপার।

—আপনার ঘর কোনটা ?

—ঐ যে স্যার, সিঁড়ির ডানপাশেই সাত নম্বর।

—আপনি আমায় মিনিট দশেক সময় দিলে আপনার ঘরে বসে একটু কথা বলতুম।

—নিশ্চয়ই স্যার, চলুন স্যার।

শশীকান্তর সঙ্গে সিঁড়ির দু'তিন ধাপ ওঠার পর জ্ঞানব্রত আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি স্নান করতে যাচ্ছিলেন ?

হ্যাঁ স্যার! সকালে জল পাওয়া যায় না, সবাই অফিস যায়, দশটার মধ্যেই চৌবাচ্চা খালি···তাই আমি বিকেলেই···

—ঠিক আছে। আপনি স্নান করে আসুন, আমার তাড়া নেই। আমি আপনার ঘরে অপেক্ষা করছি।

—না, না, স্যার, আমি পরে চান করবো। একদিন চান না করলেও ক্ষতি নেই।

কিন্তু জ্ঞানব্রতর পক্ষে গামছা-পরা খালি গায়ে একজন লোকের দিকে সমনাসামনি তাকিয়ে কথা বলা সম্ভব নয়। তাঁর রুচিতে বাঁধে।

এবার তিনি বেশ জোর দিয়ে বললেন, না, এখনি আগে স্নান সেরে আসুন!

শশীকান্ত তবু ওপরে উঠে এসে সাত নম্বর ঘরের তালা খুলে,

দরজাটা হাট করে বললে, আপনি ভেতরে বসুন তবে, স্যার, আমি দু'মিনিটের মধ্যে চান করে আসছি।

লোকটি বুদ্ধি করে এবার একটি লুঙ্গি ও জামা সঙ্গে নিয়ে গেল।

শশাকান্তর ব্যবহারে এরমধ্যেই জ্ঞানব্রত একটু দুঃখিত হয়েছেন। ও একজন গায়ক, একজন শিল্পী, ও কেন একজন অচেনা লোকের সঙ্গে এমন স্যার স্যার বলে কথা বলবে ঃ সব শিল্পীরই আত্মাভিমান থাকা উচিত।

ঘরখানা স্যাঁতসেতে, অন্ধকার। এরকম ঘরে জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী বহুদিন ঢোকেন নি। এরকম অস্বাস্থ্যকর ঘরেও মানুষ দিব্যি বেঁচে থাকে তাই না? তারাও হাসে, স্ফূর্তি করে এবং ভবিষ্যৎ কালে মানুষদের জন্ম দেয়।

ঘরের মধ্যে পাশাপাশি তিনটি খাট, তার মধ্যে দুটি খাটের বিছানা গোটানো। অন্য বিছানাটি পাতাই রয়েছে। তার চাদরটা তেল চটচটে। সম্ভবত ঐ বিছানাটা শশাকান্তর। দেয়ালে দুটি ক্যালেণ্ডার ছাড়া ঘরে আর কোনো আসবাব নেই। অন্ধকারটা একটু চক্ষে সইতে জ্ঞানব্রত দেখতে পেলেন, দুদিকের দেয়ালে দুটি আলনাও রয়েছে, তাতে জামা-কাপড় ডাঁই করা।

একটি বিছানা গুটোনো খাটে জ্ঞানব্রত বসলেন অতি সন্তর্পণে। সারা ঘর জুড়ে রয়েছে বিশ্রী গন্ধ, অনেকটা পচা চামড়ার গন্ধের মতন। এক পায়ের ওপর আর এক পা তুলে জ্ঞানব্রত পায়ের ডগাটি নাড়তে লাগলেন।

সিগারেটের তৃষ্ণাটা এই সময় তীব্র হয়ে ফিরে এলো। একা কোথাও বসে কারুর জন্য অপেক্ষা করায় সিগারেটের অভাবটা বেশী অনুভব করা যায়।

ছু'মিনিট না হোক, প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো শশীকান্ত। হুডুস-ধাড়ুস করে গায়ে জল ঢেলেই সে ছুটে এসেছে। ভিজে চুল ঝুলছে মুখের চার পাশে।

—আপনি চা খাবেন, স্যার ?

জ্ঞানব্রত প্রথমে বললেন, না, তার পর একটু থেমে বললেন, আপনি আগে চুল আঁচড়ে নিন।

জ্ঞানব্রত ঠিক হুকুম করতে না চাইলেও তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধেও তাঁর গলায় সেইরকম একটা সুর ফুটে ওঠে। প্রত্যেক দিন অনেকগুলি মানুষ তাঁর আদেশ মেনে কাজ করে। সেই জন্যই জ্ঞানব্রতর এইভাবে কথা বলা অভ্যেস হয়ে গেছে।

শশীকান্ত একটা খাটের তলায় উঁকি দিয়ে টেনে আনলো একটা কাঠের আয়না চিরুনী। তা দিয়ে ঝটাপট চুল আঁচড়ে ফেললো।

শশীকান্ত একটা সবুজ লুঙ্গির ওপর পরেছে একটা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী। এ রকম রঙের অসামঞ্জস্যে জ্ঞানব্রতর চক্ষুকে পীড়া দেয়। তবু তিনি মুখে পাতলা হাসি ফুটিয়ে রেখেছেন।

—আপনি রেডিওতে গান করেন ?

—হ্যাঁ স্যার। আপনি কি রেকর্ড কোম্পানি থেকে এসেছেন ?

—না। আমার সঙ্গে ওসবের কোন সম্পর্ক নেই। একদিন রেডিওতে আপনার একটা গান শুনে···ই'য়ে আমার···।

জ্ঞানব্রত ঠিক শব্দটি খুঁজে পেলেন না। বস্তুত দিনের অধিকাংশ সময়ই তাঁকে ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। বাংলা কথার মধ্যেও মিশে যায়—ইংরেজি পরপর ছু'তিনটে টানা বাংলা বাক্য বলার অভ্যেস তাঁর নেই।

—তিনি সংক্ষেপে বললেন, ভালো লেগেছিল।

—কোন গানটা স্যার !

—শহরে ষোলজন বোম্বেটে···করিয়ে পাগলপারা···।

—ও, ওখানা বড় ভালো গান স্যার ! সকলেরই ভালো লাগে।

—লালন ফকিরের, তাই না ?

—ঠিক ধরেছেন, স্যার ! তবে লালন ফকিরের গানে কপি রাইট নাই। রেডিও'র লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ··

জ্ঞানব্রত একটা নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেললেন।

তারপর পকেট থেকে একটা ছোট বাক্স বার করে খুললেন। সেটির মধ্যে রয়েছে একটি নতুন হাতঘড়ি।

বাক্সটি শশীকান্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে জ্ঞানব্রত অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, আপনার গান শুনে আমার ভালো লেগেছিল সেইজন্য সামান্য একটি উপহার এনেছি। আপনি নিলে আমি খুব খুশী হবো।

শশীকান্ত নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না যেন ! রেডিওতে একখানা গান শুনে কেউ এসব দামি জিনিস উপহার দিতে পারে ? রেড়িওতে তো সবাই বিনা পয়সায় গান শোনে। পুরো একদিনের প্রোগ্রামের জন্য রেডিও থেকে সে পায় পঞ্চাশ টাকা মাত্র। আর এই ভদ্রলোক একখানা গান শুনে দিচ্ছেন একটা ঘড়ি। এর দাম পাঁচশো না হাজার কে জানে !

—এটা সত্যিই আমায় দিচ্ছেন স্যার ?

—আপনার জন্যই এটা এনেছি।

বস্তুত এটাও জ্ঞানব্রতর সাহেবী ব্যবহারেরই একটা অঙ্গ। এদেশের লোক অন্য লোকের সময়ের দাম দিতে জানে না। যখন তখন অন্যের

বাড়ীতে বিনা অ্যাপয়েণ্টমেণ্টে গিয়ে তাদের সময় নষ্ট করতে কারুর বাধে না। কিন্তু নিজের গরজে কারুর কাজে গেলে তার বিনিময়ে কিছু দেওয়া উচিত। জ্ঞানব্রত তো নিজের গরজেই এসেছেন।

শশীকান্ত মুগ্ধভাবে ঘড়িটি দেখছে। সেদিক থেকে তার চোখ ফেরাতে পারছে না। বোঝাই যায় সে কখনো নিজস্ব হাতঘড়ি হাতে পরার সুযোগ পায় নি।

—আমার একটা উপকার করবেন ?

চমকে উঠে শশীকান্ত বললো, কী বলুন, স্যার ?

—সেদিন রেডিওতে আপনার ঐ গানটা আমার পুরোপুরি শোনা হয় নি। যতটা শুনেছিলাম তাও মনে নেই। ঐ গানটি আমাকে আর একবার গেয়ে শোনাবেন ?

—এখন শুনবেন, স্যার ; এখানে মিউজিক টিউজিক কিছু নেই, রেডিও ষ্টেশানে ওদের সব ব্যবস্থা থাকে। আচ্ছা। আমি খালি গলাতেই শোনাতে পারি অবশ্য—

হঠাৎ জ্ঞানব্রতর মনে হলো, মেসের এই গুমোট-অন্ধকার ঘরে বসে ঐ গানটা শুনলে তাঁর ভালো লাগবে না। বরং আরো ভালো লাগাটা কেটে যাবে।

তিনি হাত তুলে বললেন, থাক। এখন থাক। এক কাজ করলে হয় বরং···একদিন আমার বাড়ীতে গিয়ে ঐ গানটা গাইবেন। তাহলে টেপে তুলে রাখতে পারি। যাবেন আমার বাড়িতে ?

শশীকান্ত তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গিয়ে বললো, নিশ্চয়ই যাবো, স্যার। কোথায় আপনার বাড়ি ? কবে যাবো ?

কোটের পকেট থেকে জ্ঞানব্রত নিজের একটা কাড বার করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই যে, এতে সব লেখা আছে।

যদি শশীকান্ত ইংরেজি না পড়তে পারে, সেইজন্য তিনি মুখেও নির্দেশ দিয়ে দিলেন তার বাড়ির অবস্থান সম্পর্কে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কাল থেকে এই রবিবারের মধ্যে যে কোনো দিন সন্ধ্যেবেলা আসতে পারেন। সাতটার পর থেকে আমি বাড়িতে থাকবো।

—কালই যাবো, স্যার।

—আপনি এ গান কার কাছ থেকে শিখেছেন?

—কুষ্টিয়ায় যখন ছিলাম, তখন বাবন্ সাঁইয়ের কাছ থেকে শিখেছিলাম। বাবন্ সাঁই অনেক গান শিখিয়েছেন আমায়। তিনি খোদ লালন ফকিরের শিষ্যের শিষ্য!

—কুষ্টিয়া?

—হ্যাঁ স্যার। সেখানেই আমার বাড়ি।

—এখানে এসেছেন কবে?

—এসেছি তো স্যার দুই বৎসর আগে··তারপর স্রোতের শ্যাওলার মতন ভেসে বেড়াচ্ছি। কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই। এখানে এই ঘরে পরেশ রায় থাকেন। তিনি আমাদের গ্রামের লোক, তিনি দয়া করে কিছুদিনের জন্য আমায় থাকতে দিয়েছেন। তা অন্য যে একজন আছেন তিনি পছন্দ করেন না আমায়। তিনি একঘরে তিনজন থাকা নিয়ে ম্যানেজারের কাছে কমপ্লেন করেছেন।

—আপনার বাড়ির অন্য লোকজন কোথায়?

—আমার মা বাবা কেউ নেই, স্যার। আর দুচার মাস পরে আমি নিজেই একখানা ঘর ভাড়া করতে পারবো মনে হয়। রেডিও আর্টি

হবার পর দু'চার জায়গায় ফাংশানে চান্স পাই, স্যার। পঁচাত্তর টাকা করে দেয়।

—কুষ্টিয়ার কোন গ্রামে ছিল আপনার বাড়ি?

—কুমারখালী। আপনি কুমারখালী গ্রামের নাম শুনেছেন, স্যার? কুমারখালীতে থানাও আছে—।

যেন একটা বিদ্যুৎ চমকালো জ্ঞানব্রতর মাথার মধ্যে। তাঁর মনে পড়ে যায় তাঁর দাদামশাইয়ের মুখখানা। লম্বা চেহারা, সারা মুখে দাড়ি। সম্রাট শাহজাহানের মতন পেছনে দুটি হাত দিয়ে পায়চারি করতেন লম্বা টানা বারান্দায় আর মুখে প্রায় সব সময়ই থাকতো গুনগুন গান। গান বাজনার দারুন ভক্ত ছিলেন তিনি। সেই দাদামশাইয়ের মুখেই জ্ঞানব্রত এই গানটা শুনেছেন অতি শৈশবে। ক'দিন ধরে সেই কথাটাই মনে করতে পারছিলেন না।

হ্যাঁ, একথাও মনে পড়ছে যে দাদা মশাইয়ের কাছে প্রায়ই একজন ফকির এসে গান শোনাতেন। দু'জনে বন্ধুত্ব ছিল খুব। সেই ফকিরই কি বাবন সাঁই।

জ্ঞানব্রত অনেকটা আপন মনেই বললেন কী আশ্চর্য যোগাযোগ? ঐ কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে আমিও থাকতাম!

—আপনার বাড়ি কুমারখালীতে, স্যার? কোন বাড়ি?

—আমাদের নিজেদের বাড়ি নয়, মামার বাড়ি, সেখানেই আমি বেশী থেকেছি। আমার দাদামশাই ছিলেন সত্যপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার, বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ি। খুব নামকরা বাড়ি—।

জ্ঞানব্রত সেখানে ছিলেন মাত্র ন' বছর বয়েস পর্যন্ত। সেই সময়

দাদামশাই মারা যান। তারপর এগারো বছর বয়েসে পিতৃবিয়োগ। তারপর থেকে অনেকগুলি দুঃখ কষ্টের বছরের কথা স্পষ্ট মনে আছে জ্ঞানব্রতর, কিন্তু তার আগের কথা কিছুই মনে পড়ে না। অথচ সেই সময়টা ছিল কত সুখের।

অনেকের তো দু'তিন বছর বয়েসের কথাও কিছু কিছু মনে থাকে। অথচ জ্ঞানব্রতর শৈশবটা নিশ্চিহ্ন। শুধু একটা গান, সেই সময় শোনা একটা গান এতদন পরে ফিরে এলো।

জ্ঞানব্রত সেই ধরনের মানুষ নন যে তিনি এক সময় কুষ্টিয়ায় ছিলেন বলেই আর একজন কুষ্টিয়ার লোককে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরবেন আনন্দে। ওরকম দেশোয়ালি প্রীতি তাঁর নেই। বস্তুত পূর্ব বাংলা সম্পর্কে তীব্র কোনো নস্‌টালজিয়াও তিনি বোধ করেন না। মানুষ বাঁচে বর্তমান দিয়ে, হঠাৎ জ্ঞানব্রত শশীকান্তকে বললেন, আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন।

শশীকান্ত আবার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

—আপনার বাক্স-বিছানা নিয়ে চলুন আমার সঙ্গে। আপনার থাকবার জায়গার অসুবিধে বলছিলেন, আপনি আমার বাড়িতে থাকবেন।

—আপনার বাড়িতে থাকবো, স্যার?

—হ্যাঁ।

—আজই?

—তাতে অসুবিধে কি আছে?

—পরেশদাকে কিছু বলে যাবো না?

—ওকে চিঠি দিয়ে যান। পরে আর একদিন এসে সব বুঝি

বলবেন। আমার বাড়ীতে অনেক জায়গা আছে। আপনার অসুবিধে হবে না।

—না, না আমার আর কী অসুবিধে, আমি যেখানে সেখানে থাকতে পারি ··কিন্তু, সত্যি বলব স্যার? কেমন কেমন সব লাগছে। মনে হচ্ছে যেন রূপকথা। আপনি এসে আমায় একটা ঘড়ি দিলেন তারপর বললেন, আপনার বাড়িতে থাকতে দেবেন এও কি সম্ভব।

জ্ঞানব্রত এবার বেশ জোরে জোরে হাসলেন!

তারপর বললেন, আপনাদের এই গলির মোড়ে আমার গাড়ি আছে। আমি সেখানে অপেক্ষা করছি! আপনি তৈরি হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন।

শশীকান্তকে আর কিছু বলতে না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন জ্ঞানব্রত।

নিজের বাড়িতে এসে শশীকান্তকে নিয়ে সরাসরি উঠে এলেন দোতলায়।

এখানে একটি গেষ্ট রুম সারা বছর সাজানোই থাকে। অতি নিকট আত্মীয় কেউ এলেই তবে তাঁকে রাখা হয় এই দোতলার ঘরে। এ ছাড়া একতলায় আরও দুটি ঘর আছে।

শশীকান্তকে ঘর এবং সংলগ্ন বাথরুম দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন জ্ঞানব্রত, এই সময় সুজাতা এসে সেখানে দাঁড়ালো। যতই অবাক হোক মুখে তার কোনো চিহ্ন ফোটাবে না সুজাতা, তবু মনে মনে সে ভাবছে, হঠাৎ কী হলো মানুষটার? গত কয়েকদিন ধরে যে-রকম ব্যবহার করছে। তা কিছুতেই তার চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। এই রকম একটা কাঠের মিস্ত্রী টাইপের লোককে ধরে এনে দোতলার ঘরে রাখতে চায়।

জ্ঞানব্রত স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, সুজাতা, ইনি একজন শিল্পী, এর নাম শশীকান্ত দাস, আজ থেকে ইনি আমাদের এখানে থাকবেন। দেখো, যেন এর কোনো অযত্ন না হয়।

শশীকান্ত এগিয়ে এসে সুজাতার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই সুজাতা 'আরে' 'আরে' বলে দু'তিন পা পিছিয়ে গেল।

জ্ঞানব্রত বললেন, উজ্জয়িনী কোথায়? ওর সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দিতে চাই।

পরদিনই জ্ঞানব্রত চলে গেলেন মাদ্রাজে।

বাড়িতে যে কী একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে গেলেন, তা জ্ঞানব্রত খেয়ালও করলেন না। কয়েকটা দিন তিনি একটু পাগলামিতে মেতে ছিলেন; কিন্তু কোম্পানীর নানান কাজ তাঁকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ডাকছে।

মাদ্রাজ থেকে দিল্লী, সেখান থেকে উলটে আবার বাঙ্গালোর, তারপর বোম্বাই। অর্থাৎ সাতদিনে প্রায় পাঁচ হাজার মাইল ওড়াউড়ি করতে হলো জ্ঞানব্রতকে।

এদিকে বাড়িতে এক অদ্ভুত অতিথি।

প্রথম গোলমাল শুরু হলো সকাল আটটায়।

সুজাতা কোনদিনই ন'টার আগে জাগে না। এখন স্বামী কলকাতায় নেই, এখন তো আরও বেলা পর্যন্ত ঘুমানো যায়। কাল রাতে সুজাতা স্লিপিং পিল খেয়ে শুয়েছে। তবু আটটার সময়েই তার ঘরের দরজায় দুম দুম ধাক্কা।

বেশ কিছুক্ষণ পর ঘুম-জড়িত চোখে দরজা খুলে সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার!

সুজাতার শিক্ষা-দীক্ষা এমনই যে, সে কোনো কারণে বিরক্ত হলেও প্রথমেই ঝি-চাকরের ওপর ধমকে ওঠে না, কিংবা বাড়িতে ডাকাত পড়া অথবা আগুন লাগার মতন বিচলিত হয়ে ওঠে না যখন তখন।

সারদা এ বাড়ির বাসনপত্র মাজে, ঘর ঝাড় দেয়। সে প্রায় চোখ কপালে তুলে বললো, ও দিদিমণি! ও ঘরের বিছানায় কে একটা ডাকাতের মতন লোক ঘুমিয়ে আছে? কী সাংঘাতিক কথা! শিগগির পুলিশে খবর দাও?

মাথায় ঘুমের নেশা, সুজাতার আগের রাত্রির কথা স্পষ্ট মনে পড়লো না। সারদা আঙ্গুল তুলে গেষ্ট রুমটা দেখাল। সেখানে একজন লোক ঘুমিয়ে আছে! কে!

—বাবু কোথায়?

—বাবু তো ভোরবেলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তখন সুজাতার মনে পড়লো, জ্ঞানব্রতর আজ সকাল ছ'টা দশের ফ্লাইট ধরার কথা। নিশ্চয়ই পাঁচটার মধ্যে গেছে। এসব দিনে জ্ঞানব্রত কখনো স্ত্রীকে ডাকেন না।

কিন্তু গেষ্ট রুমে কে শুয়ে থাকবে?

—রতন কোথায়?

—রতন দুধ আনতে গেছে, এখনো আসে নি।

এ বাড়ির কাজের লোকরা রাত্তিরে সবাই নিচে থাকে। সিঁড়ির মাঝখানে একটা লোহার গেট থাকে। সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয় রাত্রে। রোজ ভোরে জ্ঞানব্রত সেই গেট খুলে দেন। তিনি কলকাতার বাইরে থাকলে এই সারদা এসে রাত্রে শুয়ে থাকে দোতলার বারান্দায়।

পাতলা নাইটি পরে থাকে সুজাতা। ঘরের মধ্যে ফিরে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আবার বাইরে বেরুলেন। তারপর গেষ্ট রুমের দিকে কয়েক পা এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালেন। এবার সব মনে পড়ে গেছে। সেই রাধাকান্ত না শশীকান্ত কী যেন, সেই লোকটি নিশ্চয়ই। জ্ঞানব্রত যাকে কাল রাত্রে সঙ্গে করে এনেছিলেন।

সুজাতা হেসে জিজ্ঞেস করলো, কালো মতন একটা লম্বা লোক তো? সারদা বললো, হ্যাঁ গো দিদিমণি। দেখলে ভয় করে।

—ভয়ের কিছু নেই। বাবুর চেনা লোক। জেগে উঠলে চা দিস।

সুজাতা আবার ফিরে গেল নিজের বিছানায়।

যাদের জীবনে কোনো ঘটনা ঘটে না, তারা প্রায়ই কোনো রোমহর্যক ঘটনা সম্পর্কে ভাবতে ভালোবাসে।

সারদা ধরেই নিয়েছিল যে, কোনো হুমদো চেহারার চোর এ বাড়িতে ঢুকে পড়ে, তারপর মনের ভুলে ঘুমিয়ে আছে। দরজা বন্ধ করে ওকে আটকে সবাই মিলে চেঁচিয়ে, পুলিশ ডেকে বেশ একখানা জমাট ব্যাপার হবে। সে সব কিছুই হলো না। এ রকম উট্‌কো চেহারার লোক বাবুর চেনা। বাবুদের বিছানায় শোবে? সারদার স্বামীও তো এর চেয়ে অনেক সুন্দর ছিল, সে কোনদিন বাবুদের গদীতে শোওয়ার কথা কল্পনাও করে নি।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে সারদা এবার নির্ভয়ে অতিথি ঘরে ঢুকল। বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়েছে। মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, মুখে মেচেতার দাগ, তবু সারদাকে দেখলে কোন মধ্যবিত্ত পরিবারের

গিন্নী হিসেবে অনেকের মনে হতে পারে। বেশ পরিষ্কার একটি সাদা শাড়ী পরা। এ বাড়ির দাস-দাসীরা ফিটফাট পরিচ্ছন্ন থাকবে, এই সুজাতার নির্দেশ। ওদের জামা-কাপড় কিনে দিতে সুজাতার কোনো কার্পণ্য নেই।

শশীকান্ত অঘোরে ঘুমুচ্ছে। খাটের বাইরে বেরিয়ে আছে তার একটা পা। তার শোয়ার ভঙ্গিতেও গ্রাম্যতা আছে।

অনেক রাত পর্যন্ত সে ঘুমোতে পারে নি। ঘুমোনো সহজ না কি? তার জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্তনে সে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। নরম বিছানায় শুয়ে শুয়েও উত্তেজনায় তার শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। কী হয়ে গেল ব্যাপারটা! এসব স্বপ্ন নয় তো? মাঝে মাঝে উঠে উঠে সে হাত ঘড়িটা দেখছিল। এই ঘড়িটাও সত্যি, তার নিজস্ব ঘড়ি। ঠিক যেন সোনা দিযে তৈরি।

শেষ রাতে সে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সারদা প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশী জোরে ঘর ঝাঁট দিতে লাগলো। তাতেও লোকটার ঘুম ভাঙ্গলো না দেখে সে জিনিসপত্র সরাতে লাগলো খটাখট শব্দে। এক সময় শশীকান্ত চোখ মেলে তাকাতেই সারদা ঘুরিয়ে নিল নিজের মুখটা। একটাও কথা বললো না সে লোকটার সঙ্গে। শুধু, সে যে লোকটিকে পছন্দ করে নি, এটাই বুঝিয়ে দিতে চায়।

শশীকান্তও সারদার সঙ্গে কথা বলার সাহস পেল না।

সুজাতার ভাঙ্গা ঘুম আর জোড়া লাগে নি। আরও কিছুক্ষণ বিছানায় ছটফট করার পর ডাকলেন, রতন! রতন!

রতন ততক্ষণে দুধ নিয়ে ফিরে এসেছে। চায়ের জলও চাপানো

আছে। রতন! সুজাতা ডাকা মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা নিয়ে আসতে হয়। খুব পাতলা চা দু'তিন কাপ খায় সুজাতা।

রতন চায়ের ট্রে এনে সাজিয়ে দিল সুজাতার বেড-সাইড টেবিলে।

—ঐ যিনি গেষ্ট রুমে আছেন, তাঁকে চা দিয়েছিস্?

—না।

—উনি জেগেছেন?

—হ্যাঁ।

—তা হলে চা দিস নি কেন?

—ও চা খায় কিনা তাতো আমি জানিনা।

সুজাতা হাসলো। রতনের মুখখানা ঘোঁজ হয়ে আছে। রতনের মনের ভাব বুঝতে সুজাতার একটুও অসুবিধে হয় না।

রতনের চেহারা ও পোশাক ঐ লোকটির থেকে অনেক বেশী উচ্চাঙ্গের। ঐ রকম একটি লোককে ডেকে এনে বাবুদের বিছানায় শোওয়ানো হবে, এটা সে পছন্দ করবে কেন? এ রকম লোককে সেবা করতেও সে অরাজী।

—ওকে জিজ্ঞেস কর। উনি যদি চা না খান, তা হলে এক কাপ দুধ দে। উনি খুব ভালো গান করেন।

—আজ দুপুরেও এখানে খাবে?

—খাবেন তো নিশ্চয়ই। উনি এখানে বেশ কয়েকদিন থাকবেন। তোদের বাবু তাই তো বলে গেছেন।

এবার সুজাতা স্নানের ঘরে ঢুকবে। এরপর অন্তত: এক ঘণ্টার জন্য সারা পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

শশীকান্ত ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে আছে উবু হয়ে। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। ঘর থেকে বেরুতে সে ভয় পাচ্ছে। জ্ঞানব্রত বাবু তাকে এ ঘরে থাকতে বলেছেন। এ ঘরের বাইরে বেরিয়ে ঘোরাঘুরি করা কি উচিত তার পক্ষে?

রতন কিছু জিজ্ঞেস না করেই এক কাপ চা রেখে গেছে তার সামনে। গরম গরম চা-টা শেষ করে ফেললো শশীকান্ত। এর আগে একবার সে বাথরুমটা দেখে এসেছে। বাথরুমে কমোড। শশীকান্ত জানে না ও জিনিস কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। ওঃ কি ঝামেলার মধ্যে তাকে ফেললেন ঐ জ্ঞানব্রত বাবু।

এর পরের বিপত্তিটা হলো অন্য রকম।

উজ্জ্বয়িনী কাল নাইট শোতে সিনেমায় গিয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে। ফিরেছে প্রায় রাত বারোটায়। সুতরাং সে শশীকান্তকে দেখে নি।

দশটা আন্দাজ ঘুম থেকে উঠেই উজ্জ্বয়িনী গেল বাথরুমে। টুথব্রাশ হাতে নিয়ে দেখলো, টুথ পেষ্ট নেই।

টুথ পেষ্ট কোম্পানীর মালিকের বাড়ীতেও কখনো টুথ পেষ্ট না থাকা বিচিত্র কিছু নয়। যে জিনিস ইচ্ছে করলেই বিনে পয়সায় শত শত পাওয়া যায়, সেই জিনিসের কথা মনেই থাকে না।

এমনও হয়েছে, সকালবেলা বাথ-রুমে টুথ পেষ্ট না পেয়ে রতনকে পাঠিয়ে দোকান থেকে টুথ পেষ্টের নতুন টিউব কিনে আনতে হয়েছে। রতন অতশত বোঝে না। সে এনেছে অন্য কোম্পানীর টুথ পেষ্ট। তখন সেটা ফেরত্ পাঠানো হলো। কিন্তু পাড়ার দোকানে গোল্ডেন ষ্টার টুথ পেষ্ট নেই। ফলে বাধ্য হয়েই অন্য টুথ পেষ্ট ব্যবহার করতে হতো।

জ্ঞানব্রত দৈবাৎ নিজের বাড়ীতে সেই অন্য কোম্পানীর টুথ পেষ্টের টিউব দেখে ফেলেছিলেন। তিনি ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করেন নি।

বাথরুমের বন্ধ দরজার আড়াল থেকে দু'বার চেঁচিয়ে ডাকল, মা, মা।

কিন্তু সুজাতা নিজেই এখন বাথরুমে বন্দী। সে এখন মেয়ের ডাকে সাড়া দিতে পারবে না।

উজ্জয়িনীর স্বভাব অত্যন্ত ছটফটে। কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করার ধৈর্য তার নেই। সব জিনিস তার এক্ষুণি, এক্ষুণি চাই।

তার মনে পড়লো। গেষ্ট রুমের সঙ্গের বাথরুমে এক সেট জিনিস সব সময় রাখা থাকে। ওখান থেকে টুথ পেষ্ট ধার করা যায়।

হাতে ব্রাশটা নিয়ে রাত-পোশাক পরা অবস্থাতেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে উজ্জয়িনী ছুটে গেল গেষ্ট রুমে।

মায়ের কাছ থেকে এইটুকু অন্ততঃ শিক্ষা পেয়েছে উজ্জয়িনী যে সে হঠাৎ অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে না, সহজে ভয়ও পায় না।

বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ লুঙ্গি পরা, খালি গায়ের একজন কালো, লম্বা লোক, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

আড়ষ্টভাবে থমকে গেল উজ্জয়িনী।

বাঘকে বশ করবার জন্য যেমন তার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে থাকতে হয়; সেই রকমভাবে চেয়ে উজ্জয়িনী জিজ্ঞেস করলো, তুমি —তুমি কে?

তার চেয়েও বেশী আড়ষ্টভাবে শশীকান্ত বললো, আজ্ঞে, আমার নাম শশীকান্ত দাস—

—তুমি এখানে কী করছো?

—আজ্ঞে, জ্ঞানব্রতবাবু আমাকে এখানে থাকতে বলেছেন।

—এখানে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি নিজে কাল রাতে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন···আমি নিজে থেকে আসতে চাই নি, তিনিই জোর করে বললেন।

উজ্জয়িনী শশীকান্তর আপাদমস্তক আর একবার দেখলো। কিছুতেই এর কথা বিশ্বাস করা যায় না। তার বাবা এই রকম একটা লোককে·· রতন রতন বলে ডাকতে ডাকতে উজ্জয়িনী বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। তারপর রতনের কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে তার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল।

সারাদিন ধরে শশীকান্তর সঙ্গে কথা বলার জন্য কেউ এলোনা।

উজ্জয়িনী চলে গেল কলেজে। একটু পরে সুজাতাও চলে গেল মহিলা সমিতির এক মিটিং-এ। সুজাতার খাওয়া-দাওয়ার কোনো ঠিক নেই। এক একদিন দুপুরে কিছু খাওয়াই হয় না। শরীর থেকে অন্ততঃ দশ পাউণ্ড ওজন খসিয়ে ফেলতে সে বদ্ধপরিকর।

রতন দুপুরের খাবার দিয়ে গেল শশীকান্তর ঘরেই।

চীনে মাটির প্লেটে ভাত, তারই মধ্যে ডাল, আলু ভাজা। আর একটি বাটিতে মাংস।

ঐ টুকুনি ভাত, শশীকান্ত তিন গেরাসে খেয়ে নিতে পারে। বস্তুতঃ ভাত ছাড়া তার আর কোনো প্রিয় খাদ্য নেই। শুধু একটু ডাল পেলেই সে পুরো এক সের চালের ভাত খেয়ে ফেলতে পারে।

সেই ভাতটুকু শেষ করে শশীকান্ত থালা চাটতে লাগলো। রতনের আর পাত্তা নেই।

মেস বাড়ির ঠাকুরও জিজ্ঞেস করে আর ভাত লাগবে? আর এ বাড়ির কেউ তা জিজ্ঞেস করলো না? এ কী রকম বাড়ি! গতকাল রাতে জ্ঞানব্রত নিজের সঙ্গেই শশীকান্তকে নিয়ে বসে ছিলেন খাবার টেবিলে। রাতে ছিল রুটি। শশীকান্ত রুটি পছন্দ করে না। তাছাড়া প্রথম দিন সে লজ্জায় বেশী খায় নি। কিন্তু প্রত্যেক দিন এরকম সিকি-পেটা খেয়ে থাকতে হলেই হয়েছে আর কি! তা হলে কাজ নেই তার নরম গদীর বিছানায়।

সারাদিন শশীকান্ত চুপচাপ শুয়ে রইলো সেই ঘরে।

রাতে অনেকটা সাহস সঞ্চয় করে ফেললো সে।

রতন খাবার নিয়ে আসতেই সে বলে উঠলো, আমি রুটি খাই না। ভাত নেই?

রতন বললো, এ বাড়িতে রাত্রিতে ভাত হয় না।

শশীকান্ত তাতেও দমে না গিয়ে বললো, বেশ। কিন্তু ও কয়খানি রুটিতে আমার পেট ভরবে না। আরও রুটি লাগবে।

খাবারের প্লেট নামিয়ে রেখে রতন ফিরে গেল। ফিরে এলো আরও প্রায় দশ বারোখানা রুটি নিয়ে।

ব্যাঙের সুরে সে জিজ্ঞেস করলো, এতে হবে?

শশীকান্ত ঘাড় নাড়লো।

তারপর মুখ তুলে, খাতির করা গলায় জিজ্ঞেস করলো—দাদার নাম কী?

খুবই অবজ্ঞার সুরে সে বললো, রতনকুমার দাস।

উৎসাহিত হয়ে শশীকান্ত বললো, আপনিও দাস। আমিও দাস। আমার নাম শশীকান্ত দাস। কুষ্টিয়ায় বাড়ি।

এতেও বরফ গললো না। আর কোনো উত্তর না দিয়ে রতন চলে গেল। যেন সে বুঝিয়ে দিতে চায়, তার দাস আর শশীকান্তর দাস এক নয়। বাংলাদেশের লোক। তাই ধরণ ধারণ এরকম।

প্রায় এই রকম ভাবেই সাতটা দিন কাটলো।

নির্জনতায় অতিষ্ঠ হয়ে সপ্তম রাত্রিতে মরীয়া হয়ে গিয়ে শশীকান্ত ধরলো গান। বেশ উঁচু গলায়। সেই গানটা, 'শহরে ষোলোজন বোম্বেটে—

তখন উজ্জয়িনীর ঘরে রেকর্ড প্লেয়ারে বাজছে ইংরেজি বাজনা।

অষ্টম দিন দুপুরের দমদম এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছুলেন জ্ঞানব্রত।

আগে থেকে খবর দেওয়া আছে। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে বাইরে। সঙ্গে একটা ছোট ব্যাগ ছাড়া মালপত্রের ঝঞ্ঝাট নেই।

জ্ঞানব্রত দ্রুত বেরিয়ে আসছেন বাইরে, হঠাৎ একটি সুন্দরী তরুণী মেয়ে কোথা থেকে তাঁর পথ আটকে দাঁড়ালো।

এক গাল হেসে মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, আমায় চিনতে পারছেন?

মুখে একটানা ভ্রমণের ক্লান্তি, হাতে একটা ভারি ব্রীফকেস, জ্ঞানব্রত চাইছিলেন কোনোক্রমে এয়াঁরপোর্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে গলার টাই ও জামার বোতাম খুলে ফেলতে।

সামনে মেয়েটিকে দেখে তাকে থমকে দাঁড়াতেই হলো।

মেয়েটি সারা মুখে ঝলমলে হাসি ফুটিয়ে বললো, নিশ্চয়ই আমাকে ভুলে গেছেন? আমি কে বলুন তো?

এই কয়েকটা দিন বাইরে বাইরে ঘুরে সম্পূর্ণ অন্যরকম মানুষজনের মধ্যে থাকতে হয়েছে। জ্ঞানব্রত বাংলাতে কথা বলারও কোনো

সুযোগ পান নি। হঠাৎ কলকাতায় পা দেবার পর মুহূর্তেই কেউ এরকম পরীক্ষায় ফেললে তিনি পারবেন কেন?

মেয়েটিকে চেনা লাগছে ঠিকই।

জ্ঞানব্রত দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন। মেয়েটি বেশ রূপসী, সঙ্গে কেউ নেই, এয়ারপোর্টে একা, তবে কি কোনো এয়ার হোস্টেস? কিন্তু এয়ার হোস্টেসদের পোশাকের মধ্যে কী রকম যেন নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার থাকে, সেটা দেখলে বোঝা যায়। এর পোশাক সে রকম নয়। বেশ একটা চড়া রঙের লাল শাড়ী পরে আছে।

মেয়েটি জ্ঞানব্রতর চোখে চোখ রেখে প্রতীক্ষা করছে বলে তিনি বললেন, হ্যাঁ চিনতে পারবো না কেন?

—আমার নাম বলুন তো?

নামটা তো মনে নেই বটেই, এমনকি কোথায় যে দেখেছেন মেয়েটিকে, তাও মনে করতে পারছেন না জ্ঞানব্রত।

—এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? এই তো মাত্র দশ বারো দিন আগে দেখা হয়েছিল।

—কোথায়?

—ক্যালকাটা ক্লাবে। আপনার এক বন্ধু আলাপ করিয়ে দিলেন, কতক্ষণ আপনার টেবিলে বসলাম।

—এলা?

—যাক, চিনতে পেরেছেন তাহলে।

জ্ঞানব্রত বুঝতে পারলেন, কেন মেয়েটিকে তিনি ঠিক প্লেস করতে পারছিলেন না। এ রকম একটি সুশ্রী মেয়েকে মাত্র কয়েকদিন আগেই দেখে তাঁর ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু সেদিন মেয়েটি-

জিন খেয়ে নেশা করেছিল বলে তার চোখ দুটি ছিল কাঁচের মতন। আর প্রায় সর্বক্ষণই দেখেছিলেন বসে থাকা অবস্থায়। আজ একে দেখছেন একেবারে ভিন্ন পরিবেশে। বিভিন্ন রকম চুল বাঁধবার কায়দাতেও মেয়েদের মুখ অনেকখানি বদলে যায়।

—জানেন, আজ ট্যাক্সি স্ট্রাইক ?

বিমান যাত্রীদের কাছে এ সংবাদ বেশ একটা বড় সমস্যা বটে, কিন্তু জ্ঞানব্রতের মনে কোনো দাগ কাটলো না। কলকাতা শহরে তাঁর ট্যাক্সি চড়ার কোনো অবকাশ হয় না। তাঁর জন্য নিশ্চয়ই গাড়ি অপেক্ষা করছে বাইরে।

—তুমি কোথাও যাচ্ছো, না আসছো ?

এলা আবার হেসে ফেললো। তারপর ছেলেমানুষদের মতন দুষ্টুমীর সুরে বললো, আমি কোথাও যাচ্ছিও না, আসছিও না।

জ্ঞানব্রত ব্রীফকেসটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিলেন।

—আমি একজনকে পৌঁছে দিতে এসেছিলাম।

—ও।

—আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো হলো। চলুন একটু কফি খাবেন ? সেদিন আপনি আমাকে অনেক খাইয়ে দিলেন আজ আমি আপনাকে খাওয়াবো।

একটু ইতস্ততঃ করে জ্ঞানব্রত বললেন, ঠিক কফি খাবার ইচ্ছে এখন আমার নেই, বাড়ি ফেরার একটু তাড়া আছে, ওটা না হয় আর একদিন হবে।

—আপনার গাড়ি আছে নিশ্চয়ই ? আমি কিন্তু লিফ্‌ট নেবো।

—খুব ভালো কথা।

—আসবার সময় কী কাণ্ড! আমার এক দিদি আজ আগরতলায় গেল। সঙ্গে অনেক মালপত্র, এদিকে ট্যাক্সি বন্ধ·· শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে একটা শেয়ারের গাড়িতে ··

টার্মিনালের বাইরে এসে জ্ঞানব্রত স্থির হয়ে দাঁড়ালেন এক জায়গায়। গাড়ি তাঁকে খুঁজতে হবে না। গাড়ির ড্রাইভারই তাঁকে খুঁজে বার করবে।

—কোথায় আপনার গাড়ি? কত নম্বর?

—ব্যস্ত হবার কিছু নেই, গাড়ী আসবে এখানে।

—জানেন, আপনি আমার একটা দারুণ উপকার করেছেন?

জ্ঞানব্রত রীতিমতন অবাক হয়ে বললেন, আমি! আমি আপনার কী উপকার করেছি? মাত্র একদিন দেখা।

—চলুন, গাড়িতে যেতে যেতে বলছি।

ঠিক এই সময় একজন কেউ ডাকলেন, জ্ঞানদা! জ্ঞানদা!

জ্ঞানব্রত মুখ ফিরিয়ে দেখলেন বাবুল আমেদ হন্তদন্ত হয়ে আসছে এই দিকে। দু'হাতে দুটি সুটকেস।

বাবুল আমেদ মোটাসোটা, হাসি খুশী মানুষ। কার্ড বোর্ড বক্সের বেশ বড় ব্যবসা আছে। বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্সের ভাইস প্রেসিডেণ্ট। জ্ঞানব্রতর চেয়ে দু'তিন বছর বড়ই হবেন, কিন্তু ইনি প্রায় সবাইকেই দাদা বলে ডাকেন।

—আরে দাদা, কী ঝামেলায় পড়েছি। আমার ফেরার কথা ছিল গতকাল। সে ফ্লাইট মিস করেছি, তারপর আর খবরও দিতে পারিনি, সেই জন্য আমার গাড়ি আসেনি। এদিকে আবার ট্যাকসি স্ট্রাইক। আপনার কী অবস্থা?

জ্ঞানব্রত বললেন, চলুন, আপনাকে আমি নামিয়ে দিচ্ছি।

এলার মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছায়া পড়লো। গাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সে পছন্দ করছে না।

জ্ঞানব্রতর কোম্পানির গাড়ি তখনই চলে এলো সামনে। ড্রাইভার নেমে সেলাম করতেই জ্ঞানব্রত বললেন, পেছনের বুট খুলে দাও, এই সাহেবের স্যুটকেস যাবে।

এলা বললো, আমি সামনে বসি।

বাবুল আমেদ বললেন, না, না, আপনি সামনে বসবেন কেন? আমি বসবো। আমার সামনে বসাই অভ্যেস।

গাড়ি চলতে শুরু করার পরই বাবুল আমেদ ব্যবসাপত্রের কথা শুরু করে দিলেন। দাদা, আপনি স্টেট ট্রেডিং-এর মালহোত্রাকে চেনেন? এবার দিল্লীতে গিয়ে দেখলাম।...

জ্ঞানব্রত হুঁ হুঁ দিয়ে যেতে লাগলেন।

হঠাৎ কথা থামিয়ে বাবুল আমেদ বললেন, রোককে। ড্রাইভার সাহেব, এখানে একটু রুখে দিন তো।

—কী হলো?

—এই সামনের দোকান থেকে একটু কোল্ড ড্রিংকস নেবো। অনেকক্ষণ ধরে তেষ্টা পেয়েছে। হঠাৎ কী রকম গরমটা পড়ে গেল দেখলেন?

গাড়ী থামতে পাশের দোকানে চার বোতল কোল্ড ড্রিংকসের অর্ডার দিলেন বাবুল আমেদ, অর্থাৎ ড্রাইভারের জন্যও একটা। পেছনের সীটে দুটি বোতল বাড়িয়ে দিয়ে তিনি জ্ঞানব্রতকে বললেন, দাদা এ আপনার মেয়ে তো? এতক্ষণ চিনতেই পারিনি,

সেই অনেকদিন আগে একবার দেখেছিলাম, ফ্রক পরার বয়েস তখন—

এরকম ভুল করার জন্য বাবুল আমেদকে দোষ দেওয়া যায় না।

এলা তো জ্ঞানব্রতর মেয়েরই প্রায় সমবয়েসী। তাছাড়া অনাত্মীয় যুবতী মেয়েকে নিয়ে গাড়ীতে ঘোরার সুনাম জ্ঞানব্রতর নেই ব্যবসায়ী মহলে।

এলা মুখটা ফিরিয়ে থাকে।

জ্ঞানব্রত একটু বিব্রতভাবে বললেন, না, না, আমার মেয়ে না। মেয়ের বান্ধবী, এয়ারপোর্টে হঠাৎ দেখা হলো।

জ্ঞানব্রতকে সামান্য মিথ্যে কথা বলতে হলো। এলা তাঁর মেয়ের সঙ্গে এক বছর এক কলেজে পড়েছে বটে, কিন্তু তার মেয়ের বান্ধবী নয়। উজ্জয়িনী এলার নাম শুনে ভালো করে চিনতেই পারে নি। বয়েসের তুলনায় এলা অনেক বড হয়ে গেছে।

আবার গাড়ি চলতে শুরু করার পর বাবুল আমেদ আবার ফিরে গেলেন ব্যবসার কথাবার্তায়। এলা কোনো কথা বলার সুযোগ পেল না।

বাবুল আমেদ নামলেন মৌলালীতে।

তারপর এলা গম্ভীরভাবে বললো, আমাকে এসপ্লানেডে ছেড়ে দিলেই হবে।

—তোমার বাড়ি কোথায়?

—অনেক দূরে, বেহালার কাছে।

বেহালা অনেক দূরে তো বটেই তাছাড়া একেবারে অন্য রাস্তায়। জ্ঞানব্রত অতিশয় ভদ্র, মাঝপথে কোনো মহিলাকে গাড়ী থেকে

নামিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ী পৌঁছে পোশাক বদলাবার জন্য তাঁর মনটা ছটফট করছে।

এখন রাত সাড়ে ন'টা। একবার তিনি ভাবলেন, তিনি আগে বাড়ী গিয়ে তারপর ড্রাইভারকে বলবেন, বেহালায় এই মেয়েটিকে পৌঁছে দিতে? তাঁর বাড়ীর সামনে গাড়িতে এলা বসে থাকবে....।

জ্ঞানব্রতকে দ্বিধা করতে দেখে এলা বললো, আমাকে এই সামনে এসপ্লানেডে নামিয়ে দেবেন, আমার কোনো অসুবিধে নেই। আপনার সঙ্গে দেখা না হলে তো আমি মিনি বাসেই ফিরতাম।

জ্ঞানব্রত জোর দিযে বললেন, না সে প্রশ্নই ওঠে না। আমি তোমার বাড়ীতে নামিযে দিযে আসবো। কতক্ষণ আর লাগবে।

—আমার বাড়ী পর্যন্ত গেলে আপনাকে একবার নামতে হবে। কথা দিন্।

—এখন, এত রাত্রে?

—ক'টা আর বাজে?

—অন্ততঃ দশটা বেজে যাবে।

—তাতে আর কী হয়েছে। এক্ কাপ চা খেযে যাবেন শুধু।

—আমি সন্ধ্যের পর চা কফি কিছু খাই না।

এবার গলা নীচু করে, মুচকি হেসে এলা বললো, হুইস্কি অবশ্য খাওয়াতে পারবো না বাড়িতে।

জ্ঞানব্রত নিয়মিত মদ্যপান করেন না। কখনো কখনো একটু একটু। এ মেয়েটি কি তাঁকে নেশাখোর ভেবেছে নাকি? পঞ্চাশ বছর বয়েস পেরিয়ে যাবার পর ক'জন লোকই বা রাত দশটার সময় চা খায়?

এসপ্লানেড আসবার পর জ্ঞানব্রত ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন বেহালার দিকে যাওয়ার জন্য। তারপর তিনি অন্যমনস্কভাবে চুপ করে গেলেন।

—আপনি আমার ওপর রেগে গেলেন?

—আরে? রাগ করবো কেন?

—কোনো কথা বলছেন না আমার সঙ্গে?

জ্ঞানব্রত ভাবলেন, এ মেয়েটা কি পাগল নাকি? হঠাৎ তিনি রাগ করতে যাবেন কেন ওর ওপরে? তা ছাড়া কোনো কিছু বলবার না থাকলেও কথা বলে যেতে হবে? এমনিতেই কম কথা বলা তাঁর স্বভাব।

—আপনার কৌতূহল খুব কম, তাই না?

—কেন? সেটা কী করে বোঝা গেল।

—আপনি আমায় এয়ারপোর্টে দেখেও প্রথমে জিজ্ঞেস করেন নি কার সঙ্গে সেখানে গেছি। তারপর এই যে আপনাকে বললাম, একবার আমার বাড়িতে নামতে হবে, তখনও জিজ্ঞেস করলেন না, বাড়িতে কে কে আছে?

জ্ঞানব্রত বুঝতে পারলেন, এবার মেয়েটি ঠিকই ধরেছে। এটা বোধ হয় সুজাতার প্রভাব। সুজাতা কখনো কারুর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করে না। নারী জাতির মধ্যে সুজাতার মতন এমন কম কৌতূহলপরায়ণা খুবই দুর্লভ।

তিনি হেসে বললেন, একটা ব্যাপারে অবশ্য আমার একটু কৌতূহল হচ্ছে, তুমি তখন বললে, আমি তোমার উপকার করেছি সেটা কী উপকার?

—আপনি রেডিও'র ষ্টেশন ডিরেকটার পি. সি. বড়ুয়ার সঙ্গে আমার আলাপ করে দিয়েছিলেন, মনে আছে ?

—হুঁ।

—উনি আমায় গানের প্রোগ্রাম দিয়েছিলেন। আগে আমি অনেকবার চেষ্টা করেও পাইনি। এবার যে পেলাম সে তো আপনার জন্যই।

—এ জন্য আমি তো কোনো চেষ্টা করি নি। যাই হোক। যদি তোমার উপকার হয়ে থাকে আর তাতে আমার কোনো যোগাযোগ থাকে, তাতে আমার খুশী হবারই কথা।

—সামনের মাসেই আমার প্রোগ্রাম।

—বাঃ !

—আপনারা বেশ মেকানিক্যাল। যখন তখন বাঃ বলতে পারেন। এলার গলায় রাগের ঝাঁঝের পরিচয় পেয়ে জ্ঞানব্রত একটু সচকিত হলেন। তিনি কোনো ভুল করে ফেলেছেন ?

—এখানে, বাঃ ! বলা বে-মানান ?

—নিশ্চয়ই বে-মানান। আমি কেন গান করি, সে সম্পর্কে আপনার একটু কৌতূহল নেই, তবুও বললেন বাঃ।

রেডিওতে প্রত্যেকদিন কত ছেলে মেয়েই তো গান গায়। তা ছাড়া জ্ঞানব্রত অতি কদাচিত রেডিও শোনেন। সুতরাং রেডিওতে কে কবে কী গান গাইবে, সে ব্যাপারে জ্ঞানব্রতর কৌতূহল বা আগ্রহ থাকবে কেন ? কিন্তু যে জীবনে প্রথম রেডিওতে গান গাইবার সুযোগ পেয়েছে, তার কাছে এটা নিশ্চয়ই খুবই উত্তেজনার ব্যাপার।

—না। না। শুনতে হবে। একদিন শুনবো তোমার গান।

—দেখি, সে দিনটা কবে আসে।

—খুব শিগগিরই একদিন ··

—একটা মুসকিল হয়েছে কী জানেন, আমি নজরুল—অতুল প্রসাদ গাই, কিন্তু বড়ুয়া সাহেব বললেন, পল্লীগীতিতে স্কোপ বেশী। ঐ প্রোগ্রামে ভালো আর্টিষ্ট পাওয়া যায় না। সেইজন্য আমার একটা করে পল্লীগীতির অনুষ্ঠানও করে যেতে হবে। আমি ফোক সং কোনোদিন তেমন শিখিনি এখন শিখতে যেতে হবে কারুর কাছে।

এতক্ষণে শশীকান্তর কথা মনে পড়লো জ্ঞানব্রতর। তিনি একজন গায়ককে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছেন। সে ছেলেটা কী করছে কে জানে? সে কি সুজাতা-উজ্জয়িনীদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছে?

—আমি একজন পল্লীগীতির গাযককে চিনি। ভালো গায়। জানি না, সে তোমায শেখাতে পারবে কি না।

—কে? কে? কি নাম?

—একদিন আলাপ করিয়ে দেবো তোমার সঙ্গে।

এলা তার ডান হাতটা সীটের ওপর দিয়ে বাড়িয়ে জ্ঞানব্রতর একটা হাতের ওপর রাখলো। জ্ঞানব্রত প্রায় শিহরিত হলেন। এ কী করছে মেয়েটা? সামনে ড্রাইভার রয়েছে। এরকমভাবে তো প্রেমিক-প্রেমিকারা হাতের ওপর হাত রাখে। মেয়েটা তাঁর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছে কেন?

জ্ঞানব্রত নিজের হাতটা সরিয়ে নিতেও পারলেন না। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আড়ষ্টভাবে বসে রইলেন।

বেহালায় বাড়ির সামনে পৌঁছে এলা আর বিশেষ জোর করলো না। জ্ঞানব্রত দু'বার না বলতেই সে বললো আচ্ছা ঠিক আছে। আজ নামতে হবে না। কিন্তু বাড়ি তো চিনে গেলেন, অন্য কোন দিন আসবেন তো ?

—হ্যাঁ, আসবো। গান শোনা আর চা পাওনা রইলো।

অদ্ভুত রহস্যময়ভাবে জ্ঞানব্রতর দিকে হেসে এলা খুব আস্তে আস্তে বলল, আমি জানি, আপনি ঠিক আসবেন।

বাড়ি ফেরার পর সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, এত দেরি হলো ? প্লেন লেট ছিল ?

—না। আজ ট্যাক্সি স্ট্রাইক। দু'জনকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে এলুম।

ভালো করে স্নান করে পা-জামা ও পাঞ্জাবী পরার পর জ্ঞানব্রত খুব স্বস্তির সঙ্গে বললেন, আঃ।

আজ তাঁর ভালো ঘুম হবে। নিজের বাড়িতে, নিজের বালিশটিতে মাথা দিয়ে ঘুমোনোর মতন আরাম আর নেই।

খাওয়ার টেবিলের কাছে এসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িটা বড্ড চুপচাপ লাগছে। খুকু কোথায় ?

—ও নাইট শো-তে সিনেমায় গেছে। বুলু মাসীদের সঙ্গে। আর একটু বাদেই ফিরবে।

—তুমি গেলে না সিনেমায় ?

—আমি কি সব সিনেমা দেখি ? তাছাড়া তুমি আজ আসবে।

—সেই ছেলেটি কোথায় ? সে খেয়েছে ?

সুজাতা এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে টেবিলের ওপর দু'হাত রেখে মুখখানা নিচু করে রইলো।

উত্তর না পেয়ে বিস্মিত হলেন জ্ঞানব্রত। চেয়ারে না বসে তিনি এগিয়ে গেলেন গেষ্ট রুমের দিকে।

সে ঘরটির দরজাটা বন্ধ। জ্ঞানব্রত একটু ঠেলতেই খুলে গেল। ঘর ফাঁকা।

এ কি? সেই ছেলেটি গেল কোথায়? শশীকান্ত? সুজাতা খুব ধীর স্বরে বলল, সে আজ সকালে কাউকে কিছু না বলে চলে গেছে। সারা দিনে আর ফেরে নি।

স্ত্রীকে দু'একটি প্রশ্ন করেই থেমে গেলেন জ্ঞানব্রত।

বাড়িতে তিনি একজন অতিথি রেখে গিয়েছিলেন। তারপর কয়েক দিন কলকাতার বাইরে থেকে ঘুরে এসে দেখলেন সেই অতিথি নেই। কোথায় গেছে কেউ জানে না। সুতরাং ধরেই নেওয়া যায় অতিথির প্রতি অযত্ন, অবহেলা, অত্যন্ত ঔদাসীন্য দেখান হয়েছিল নিশ্চয়।

কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ এমনকি উঁচু গলায় কথা বলাও জ্ঞানব্রতর স্বভাব নয়। তাঁর সব কিছুই মনে মনে।

শশীকান্ত কোথায় যেতে পারে? তার তো কোনো যাবার জায়গা নেই। যে মেস ছেড়ে চলে এসেছে, সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কারণ সেখানে একজন রুমমেট তাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত ছিল। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে? যোধপুর পার্কে বাড়ি খুঁজে পাওয়া শক্ত, অনেকেই বলে। পুলিশে ফোন করা কি উচিত হবে? শশীকান্ত একজন শক্ত সমর্থ চেহারার পুরুষ মানুষ, সে বাড়ি ফেরেনি বলে থানায় খবর দিলে যদি সেখানকার লোকেরা হাসাহাসি করে?

পোশাক বদলে জ্ঞানব্রত দুটি ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়লেন। সুজাতা বাথরুমে, উজ্জয়িনীর ঘরে রেকর্ডপ্লেয়ারে একটা উগ্র বিদেশী সুর বাজছে। জ্ঞানব্রত একদিন দেখেছিলেন, উজ্জয়িনী ঘরের মধ্যে একা একাই নাচে। তখন বড় সুন্দর দেখায় ওকে, চোখ দুটো মোহের আবেশে বুজে আসা হাতের আঙ্গুলগুলো যেন গড়া। ঠোঁটের ভঙ্গিতে অদ্ভুত সারল্য। কিছু দিন ধরে মেয়ের কথা ভাবলেই এলার কথা মনে পড়ে। ওরা প্রায় একই বয়েসী। কিন্তু দু'জনে কত আলাদা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে রাত পোশাক পরা সুজাতা নিজের খাটে শুয়ে একটা সিগারেট ধরালো। কিন্তু আজ আর ডিটেকটিভ উপন্যাস খুললো না।

—তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো?

জ্ঞানব্রত চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। চক্ষু বোজা। বুকের উপর আড়াআড়ি দুটি হাত রাখা। আজ আর ঘুমের আরাধনা করতে হবে না ট্যাবলেট তার কাজ ঠিক সময় মতন করবেই। এর সঙ্গেই হাত-পা একটু ঝিমঝিম করছে।

—না। তুমি কিছু বলবে?

—আমাদের যে এক সঙ্গে বাইরে কোথাও যাবার কথা বলেছিলে? যাবে না?

—হ্যাঁ। যাওয়া যেতে পারে। কোথায় যাবে, ঠিক করেছ?

—পুরী।

—পুরী! গত বছরই তো গিয়েছিলুম।

—গতবার তো সারাক্ষণই বৃষ্টি হলো...সমুদ্র আমার ভালো লাগে....

—ঠিক আছে। কালই হোটেল বুক করবার ব্যবস্থা করবো।

নিজের খাট থেকে উঠে এসে সুজাতা বললো, একটু সরো তোমার পাশে আমি শোবো।

—আজ বই পড়বে না ?

—কেন, তোমার পাশে শুলে আপত্তি আছে ?

জ্ঞানব্রত হাত বাড়িয়ে সুজাতার কোমর ধরে নিজের কাছে টেনে নিলেন। মনে মনে অনুশোচনা হলো। কেন ঘুমের ট্যাবলেট খেতে গেলেন আজ। আসল ব্যাপারটা হবার আগে সুজাতা অনেকক্ষন আদর পছন্দ করে। যদি তার মধ্যে ঘুম এসে যায়।

জ্ঞানব্রতর মুখটা নিজের বুকে চেপে ধরে সুজাতা জিজ্ঞাসা করলো তুমি আমার উপরে রাগ করেছো ?

—কেন, রাগ করবো কেন ?

—ঐ 'যে গায়কটি, শশীকান্ত....ও বাড়ি ফেরেনি, তুমি ভাবছ ওকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি....

—না, না, সে কথা বলবো কেন ?

—লোকটি তো কথাই বলতে চায় না, এত লাজুক, আমি দু-এক বার চেষ্টা করেছি ...তুমি শখ করে ওকে বাড়িতে ডেকে এনেছো, ওর .যাতে কোনো অযত্ন না হয় সে কথা আমি কাজের লোকেদের বলেছিলাম।

—না, না, তুমি তো যথেষ্ট করবেই, আমি জানি।

—তোমার শরীর বেশ ভাল নেই, কিছুদিন ধরেই দেখছি, তুমি অন্যমনস্ক ?

—শরীর তো ঠিকই আছে। অন্যমনস্ক থাকি বুঝি ?

—তুমি বড় বেশী পরিশ্রম করছো আজকাল।

সুজাতার উরু কি মসৃণ, তলপেটে ভাঁজ পড়েনি, বুক দুটি এখনো সুগোল। বোঝাই যায় না, তার অতবড় মেয়ে আছে। আজ জ্ঞানব্রতকে প্রমাণ করতে হবে, তিনি এখনো সক্ষম পুরুষ মানুষ। কিছুতেই ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না।

মধ্যপথে বিকট শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। বেড রুমের টেলিফোনের কানেকশন রাত এগারোটার পর অফ করা থাকে। সুজাতা নিজেই এটা করে। আজ সে ভুলে গেছে। আজই। বেশী রাতের টেলিফোনের আওয়াজে কেমন একটা গা ছম ছম করা ভয় আছে। জ্ঞানব্রতর নির্দেশ আছে অফিসের হাজার জরুরী কাজ থাকলেও কেউ যেন তাঁকে রাত এগারোটার পর বিরক্ত না করে। কিন্তু যদি ফ্যাকটরিতে আগুন লাগে ?

স্বামী আর স্ত্রী দু'জনেই একটুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে শুনলো আওয়াজটা। তারপর সুজাতা বললো, আমি ধরবো ? জ্ঞানব্রত বললেন, না, আমি ধরছি।

প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না। জড়িত গলায় কে যেন হিন্দিতে কী জানতে চাইছে।

জ্ঞানব্রত কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, হ্যালো ? হু ইজ স্পিকিং ? হুম ডু য়ু ওয়ান্ট ?

রং নাম্বার !

জ্ঞানব্রতর ইচ্ছে হলো টেলিফোন যন্ত্রটা আছড়ে ভেঙে ফেলতে। তার বদলে তিনি তার ধরে এক টান দিয়ে প্লাগটা খুলে ফেললেন।

সুজাতা ততক্ষণে উঠে বসেছে। জ্ঞানব্রত ফিরে আসতেই বললো, আজ আর থাক।

জ্ঞানব্রত আপত্তি করলেন না। তিনি জানেন, একটু কোনো রকম ব্যাঘাত ঘটলেই সুজাতার মুড অফ হয়ে যায়।

- এরপর শুতে....না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লেন জ্ঞানব্রত। যেন ট্যাবলেটের ঘুম তাঁর জন্য জানলার বাইরে অপেক্ষা করছিল।

পরদিন সকালবেলা জানা গেল শশীকান্ত বাড়ির গেটের বাইরের সিঁড়িতে বসে ঘুমোচ্ছে।

জ্ঞানব্রত নিজেই যথেষ্ট ভোরে ওঠেন কিন্তু তাঁর আগেই রঘু দেখতে পেয়েছে। খবর পেয়ে জ্ঞানব্রত সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই শশীকান্ত ধড়মড় করে জেগে উঠে চোখ কচলাতে লাগলো।

—কী ব্যাপার রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন ?

—আমি হারায় নাই স্যার, আমারে যারা পৌঁছাতে এসেছিল....

—তারা কারা ?

—ব্যাণ্ডেলে গেছিলাম স্যার, একটা ফাংশান ছিল। আসরে গাইতে দিল রাত এগারোটার পর। দুইখানা গানের পর পাবলিক বললো, আরও চাই—আরও চাই। গাইলাম আরও তিনখানা।

—বাঃ, ভালো কথা। ব্যাণ্ডেলে ফাংশান করতে গিয়েছিলে তো সে কথা এ বাড়িতে কাউকে বলে যাওনি কেন ?

—দুপুরে রেডিও স্টেশনে গেলাম। সেখানে বিমানদা বললেন, ব্যাণ্ডেলে একটা ফাংশান আছে, যাবে ? বোম্বাইয়ের একজন আর্টিষ্ট আসে নাই। ওরা সেইজন্য তিন চারজন একষ্ট্রা লোকাল আর্টিষ্ট চেয়েছে। যাবে তো এক্ষুনি চলো, একশো টাকা পাবে। তা স্যার,

একশো টাকা রেট তো আমারে আগে কেউ দেয় নাই, তাই রাজি হয়ে গেলাম। পাবলিক খুব সাপোর্ট দিছে স্যার, আমারে থামতেই দেয় না! ঐ গানটা গাইলাম, ষোলো জন বোম্বেটে....

—ঠিক আছে। বাড়ির ভেতরে এস, হাত মুখ ধুয়ে নাও।

—আপনি রাগ করছেন, স্যার?

—না। আমকে স্যার বলে ডেকো না।

—কী বলবো?

—ইয়ে, শুধু দাদা বলতে পারো।

এরপর শশীকান্তের জন্য অন্য ব্যবস্থা হলো। দোতলার সুসজ্জিত গেস্ট রুমটির বদলে তাকে পাঠানো হলো একতলার সাদা-মাটা একটি ঘরে। সেখানে সে বেশী স্বস্তি পাবে। ঘরটা বাড়ির পেছন দিকে, ইচ্ছে করলে সেখানে সে তার গানের রেওয়াজও করতে পারে। তাতে ওপর তলায় লোকেদের কোনো ব্যাঘাত হবে না। তার খাবারও পাঠিয়ে দেওয়া হবে নিচে।

এসব সুজাতারই ব্যবস্থাপনা।

খাবার টেবিলে বসে জ্ঞানব্রত বললেন, তাহলে শনিবারেই পুরীর হোটেল বুক করছি। শচীনকে বলে দিচ্ছি, আজই টিকিট কেটে ফেলবে। ভুবনেশ্বর পর্যন্ত প্লেনে যাবে, না ট্রেনে?

সুজাতা বললো, ট্রেনেই ভাল। এক রাত্রিরই তো ব্যাপার। ওখানে গাড়ি পাওয়া যাবে তো?

—হ্যাঁ, টুরিষ্ট ডিপার্টমেন্টের গাড়ি ভাড়া করলে হবে।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় ঘুম-চোখে উস্কোখুস্কো চুলে এসে হাজির হলো উজ্জয়িনী। টেবিলে বসেই

বললো, আমার জুতোটা দিয়ে দাও আমি আজ তাড়াতাড়ি বেরুবো।

সুজাতা বললো, খুশী? এই শনিবার আমরা পুরী যাচ্ছি।

উজ্জয়িনী যেন আকাশ থেকে পড়লো। সারা মুখে বিস্ময় ছড়িয়ে বললো, পুরী? এখন? তোমাদের কি মাথা খারাপ?

—কেন?

—গত বছর মনে নেই? সর্বক্ষণ বৃষ্টি।

—তা বলে কি এবারেও বৃষ্টি হবে?

—নিশ্চয়ই হবে। দেখছো না, এখানে এরই মধ্যে দু'একদিন বৃষ্টি হয়ে গেলো!

—তা হোক না। বৃষ্টির মধ্যেও সমুদ্র দেখতে কত ভালো লাগে। ইচ্ছে হলে আমরা পুরীর বদলে কোনারকে গিয়েও থাকতে পারি।

—তোমাদের ভালো লাগে তোমরা যাও।

—তুমি যাবে না?

—ইম্‌পসিবল! আমি কলকাতা ছেড়ে কিছুতেই যেতে পারবো না।

—কেন তোর এমন কি কাজ কর্ম আছে, শুনি!

—এই শনিবার দিন পারমিতার জন্মদিনের পার্টি। আমরা অনেক মজা করবো, কত দিন আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি।

—ঠিক আছে, আমরা তা হলে শনিবারের বদলে রবিবার যাবো।

—রোববার থেকে আমাদের নাটকের রিহার্সাল। আমরা মিড সামার নাইট্‌স ড্রিম করছি।

—তা হলে আমরা যাবো, তুই যাবি না?

—তোমরা কি আমায় জিজ্ঞেস করে যাওয়া ঠিক করেছো? আমার সুবিধে অসুবিধে কিছু আছে কিনা, তা একবারও ভেবে দেখবে না?

জ্ঞানব্রত চুপ করে আছেন। মেয়ে বড় হয়েছে, তার একটা নিছক মতামত তো থাকবেই। বাবা-মা যখন যেখানে যেতে বলবে, তাতে রাজি হবে কেন?

উজ্জয়িনীর ওপর জোর করেও কোনো লাভ নেই। দারুন জেদী মেয়ে।

মা ও মেয়েতে আরও কিছুক্ষণ উত্তর প্রত্যুত্তর চলবার পর জ্ঞানব্রত বাধা দিয়ে বললেন, থাক ও যদি যেতে না চায়, ও থাক।

—তা বলে বাড়িতে ও একা থাকবে?

উজ্জয়িনী এবার ফোঁস করে উঠে বললেন, হোয়াট ডু যু মীন একা? আমি কি একা থাকলে ভূতের ভয় পাবো?

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো উজ্জয়িনী একাই থাকবে। পুরীতে যাবে শুধু স্বামী স্ত্রী। জ্ঞানব্রতর ক্ষীণ আশা ছিল, যদি সুজাতা পুরো ব্যাপারটাই ক্যানসেল করে দেয়। কেননা, পুরীতে এখন বেড়াতে যাবার খুব ইচ্ছে তাঁরও নেই। কিন্তু সুজাতা যাবার জন্য বদ্ধপরিকর।

অফিসে গিয়েই হোটেলের বুকিং এবং টিকিটের ব্যবস্থা করে ফেললেন জ্ঞানব্রত। তারপর কাজে ডুবে গেলেন।

নিজে কিছুদিন তিনি কলকাতার বাইরে ছিলেন, আবার বাইরে যাচ্ছেন, মাঝখানে অনেকগুলো কাজ সেরে রাখতে হবে।

দু'দিন বাদে শেষ বিকেলে একটা টেলিফোন পেলেন জ্ঞানব্রত।

—আমি এলা বলছি। নাম শুনে চিনতে পারছেন তো?

—হ্যাঁ।

—আপনি আজ খুব ব্যস্ত?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা ব্যস্তই বলা যায়।

—তা হলে আমি যাবো না? আমার ইচ্ছে ছিল আপনার কাছে গিয়ে নেমন্তন্ন করার। টেলিফোনেই বলবো?

মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞানব্রত চিন্তা করলেন, কিসের নেমন্তন্ন? বিয়ের? এরই মধ্যে মেয়েটি বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে! আশ্চর্য!

—হ্যাঁ। বলুন, মানে, ইয়ে বলো···

—কাল সন্ধেবেলা আপনি ফ্রি আছেন তো? না থাকলেও আপনাকে সময় করতেই হবে।

—কী ব্যাপার?

—আমার এখানে একটা ছোট্ট ঘরোয়া গান-বাজনার আসর কালকে। আপনার আসা চাই। আমি কিন্তু কোনো রকম আপত্তি শুনব না। আসতে হবেই।

জ্ঞানব্রত একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগছে না। এই মেয়েটি যেন তাঁকে ক্রমশই জড়িয়ে ফেলতে চাইছে। সামান্য একটা ছোট্ট ঘরে থাকে মেয়েটি, সেখানে গান বাজনার আসর? এই মেয়েটির সব কিছুই যেন অদ্ভুত।

—আপনি কিছু বলছেন না যে, হ্যালো! হ্যালো!

—আমার পক্ষে তো কাল যাওয়া সম্ভব নয়। একটা জরুরী এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

—সন্ধে বেলাতেও কাজের অ্যাপয়েন্টমেন্ট? হি হি হি! কতক্ষণ লাগবে? আপনি একটু দেরি করে আসুন, কোনো অসুবিধাই নেই।

—একটু নয়, অনেক দেরি হবে।

—কতক্ষণ, ন'টা দশটা। তার পরেও অন্তত আসুন একটু ক্ষণের জন্য!

দশটার পরেও একটি কুমারী মেয়ে তার বাড়িতে যাবার জন্য অনুরোধ করছে। জ্ঞানব্রত এসব জীবনে একেবারেই অভ্যস্ত নয়।

তিনি কণ্ঠস্বর গম্ভীর করে বললেন, না, আমার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। দুঃখিত।

আর কিছু শোনার আগেই তিনি রিসিভার রেখে দিলেন।

এই মেয়েটিকে আর একটুও প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। একে একে-বারে মুছে ফেলতে হবে মন থেকে।

কাজ শেষ করার পর যথারীতি বাড়ী ফিরে তিনি একটু চাঞ্চল্য বোধ করলেন। আবার কি ব্লাড প্রেসার বেড়েছে? তাঁর এক বন্ধু তাঁর চিকিৎসক। তাঁর কাছে একবার যাবেন নাকি?

সারাদিন প্যাচপেচে গরম গেছে। বাথরুমে ঢুকতে গিয়েও তিনি ঘেমে গেলেন। ইচ্ছে করছে সাঁতার কাটতে। ডাক্তারও বলেছিলেন অবগাহন স্নানে ব্লাড প্রেসারের উপকার হয়।

গাড়ি নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়ে চলে এলেন ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবে। এক সময় এখানে তিনি নিয়মিতই আসতেন। হার্টের গণ্ডগোলটার পর আর আসা হয় না।

আজ ইচ্ছে করছে দু-এক বোতল বীয়ার পান করতে। এই গরমে ভালো লাগবে। কিংবা অনেক খানি বরফ দিয়ে গিমলেট। কিন্তু জ্ঞানব্রত সে ইচ্ছেটা দমন করলেন। তাঁর এক বন্ধু বোম্বাইতে তিনি

পেগ জিন খেয়ে সাঁতার কাটতে নেমেছিল। সুইমিং পুলের মধ্যেই তার হার্ট অ্যাটাক হয় চিকিৎসারও সুযোগ পায়নি।

নীল রঙের পরিস্কার জল। তলার দিকটা বেশ ঠাণ্ডা। অন্য যারা সাঁতার কাটছে তারা প্রায় সবাই সাহেব-মেম। ভারতীয়রা এই ক্লাবের সভ্য হয় বটে। কিন্তু প্রায় কেউ জলে নামে না, জলের ধারে টেবিল নিয়ে বসে মদ খায় আর আড়চোখে অর্ধনগ্ন মেমদের দেখে।

আপন মনে সাঁতার কাটতে কাটতে জ্ঞানব্রতর হঠাৎ ছেলে-বেলার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি সাঁতার শিখেছেন গ্রামের পুকুরে। কুষ্টিয়ার কুমারখালী গ্রামে। মামা বাড়িতে তাঁর সেজো মামা ন'বছর বয়স্ক জ্ঞানব্রতকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন পুকুরের মধ্যে। আকু পাকু করতে করতে ডুবে যাবার ঠিক আগে সেজো মামা এসে ধরে ফেলতেন। এইভাবে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে সাঁতার শেখা হয়ে যায়।

এসব মনে পড়ে নি তো এতদিন! ক্যালকাটা ক্লাবের সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে এসে এর আগে কোনোদিন তাঁর গ্রামের পুকুরের কথা মনে পড়েনি। শশীকান্তর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই....। কিন্তু এর মধ্যে একদিনও তো শশীকান্তর সঙ্গে গল্প করা হলো না, কিংবা শোনা হলো না তার গান।

খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে ক্লান্ত হয়ে জ্ঞানব্রত ওপরে উঠে বসলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার নামবেন। জল খুব ভালো লাগছে আজ।

হঠাৎ পুলের ডান পাশের দিকে চোখ চলে গেল তাঁর, একজন নারীর বাহু ধরে এগিয়ে আসছে একজন দীর্ঘ চেহারার পুরুষ। রেডিওর সেই পি. সি বড়ুয়া আর এলা। ওরা কোনো খালি টেবিল খুঁজছে।

জ্ঞানব্রত চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন অন্য দিকে।

সুইমিং পুলের রেলিং ধরে আস্তে আস্তে উঠে এলেন জ্ঞানব্রত। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

এলা কিংবা বড়ুয়া তাকে দেখতে পায় নি। জলের ধারে একটা টেবিলে বসে কী একটা কথায় যেন ওরা দু'জনেই হাসছে।

জ্ঞানব্রত চলে গেলেন পোশাক বদলাবার ঘরে। আগে গা মাথা মুছলেন ভালো করে। তারপর দাঁড়ালেন আয়নার সামনে। নিজের মুখটা এত অচেনা লাগছে কেন? কেন তিনি একটু একটু কাঁপছেন? তাঁর ঈর্ষা হয়েছে? এই জিনিষটা তো তাঁর কোনদিন ছিল না। এলাকে তো তিনি এড়িয়ে যেতেই চেয়েছিলেন।

পোশাক পরে নিয়ে বাইরে এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তার এখন চলে যাওয়া উচিত। ওরা গল্প করছে করুক। এর মধ্যে তিনি নানান লোকের কাছে শুনেছেন যে ঐ বড়ুয়ার খুব মেয়ে-বাতিক আছে। কোনো সুন্দরী মেয়ে পেলে ছাড়ে না।

তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। কিন্তু একটা প্রবল চুম্বক যেন তাঁকে টানছে পেছন থেকে। খুব ইচ্ছে করছে আর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দেখতে তবু তিনি শক্তভাবে হাঁটতে লাগলেন। তার পিঠে কার ছোঁয়া লাগতেই তিনি চমকে উঠে বললেন, কে?

—আপনি আমাদের দেখতে পেয়েও চলে যাচ্ছেন যে?

এলার মুখখানিাত কী চমৎকার সুস্বাস্থ্যের তাজা ভাব। কলঙ্কহীন মসৃণ, নিষ্পাপ মুখ। জ্ঞানব্রত যেন একটি বৃষ্টিভেজা সদ্য ফোটা ফুল দেখছেন। তিনি কোনো কথা বললেন না।

—আপনি চলে যাচ্ছেন যে?

জ্ঞানব্রত ভাবলেন, এই মেয়েটি প্রায় তাঁর নিজের মেয়ের বয়েসী কিন্তু উজ্জয়িনীর তুলনায় কত বেশী অভিজ্ঞ। মুখখানা যত নিস্পাপ দেখায়। মোটেই তত নিষ্পাপ নয়। যার তার সঙ্গে প্রকাশ্য জায়গায় মদ খেতে যায়। গায়িকা হিসেবে নাম কেনার জন্য পি. সি বড়ুয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। পুরুষ মানুষদের দিকে এমনভাবে তাকায় যাতে সরলতার সঙ্গে মিশে থাকে লাস্য। ক্যালকাটা ক্লাবে প্রথম আলাপের দিন জ্ঞানব্রতর দিকেও এলা এইভাবে তাকিয়ে ছিল।

অথবা, এসব দোষের নয়। জ্ঞানব্রত পুরোনো পন্থী? ব্যবসায় জগতে তিনি এমনভাবে জড়িয়ে আছেন যে পৃথিবী কতটা বদলে গেছে, তা তিনি জানেন না?

অনেককিছু বদলালেও ভালোবাসা, লোভ, দুঃখ, ঈর্ষা এসব বদলায় না। জ্ঞানব্রতর বুকের মধ্যে যে একটা জ্বালা জ্বালা ভাব, সেটা ঈর্ষা ছাড়া আর কী।

তিনি ঠাণ্ডাভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর?

এলা বললো,' আপনি আমাদের সঙ্গে একটু বসবেন না?

—আমি একটু সাঁতার কাটতে এসেছিলুম।

—একটু বসুন। এক্ষুণি চলে যাবেন!

—হ্যা, যেতে হবে।

—আপনি আমায় দেখলেই এড়িয়ে যেতে চান কেন, বলুন তো?

—ইয়ে···তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে যাওয়ার কি কোনো কথা ছিল? সুতরাং এড়িয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে কি করে? চলি।

আর কোনো কথা বলার সুযোগ দিলেন না, এবার বেশ গট গট

করে বেরিয়ে গেলেন জ্ঞানব্রত। এলাকে প্রত্যাখ্যান করতে পেরে তিনি বেশ তৃপ্তি পেয়েছেন।

একটু আগে তাঁর মনে হচ্ছিল, এলা মেয়েটি তাকে ঠকিয়েছে। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে পি. সি বড়ুয়ার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে, সুইমিং ক্লাবে লাঞ্চ খেতে এসেছে। এবার তিনি বুঝিয়ে দিলেন, এ রকম কোনো মেয়ের সঙ্গে বাজে খরচ করার মতন সময় তাঁর নেই।

কিন্তু একটু পরেই তাঁর মনের ভাব বদলে গেল আবার।

সুইমিং ক্লাবে প্রথমে বড়ুয়ার সঙ্গে এলাকে দেখে তাঁর ঈর্ষা হয়েছিল, এটা অস্বীকার করতে পারেন না। তারপর এলা তাঁকে ডাকতে এলেও তিনি ওদের সঙ্গে বসতে রাজি হন নি। এতে তিনি তৃপ্তি পেয়েছিলেন। তা হলে এখন আবার কষ্ট হচ্ছে কেন? অফিসে কোনো কাজে মন বসছে না। একটু আগে একজন সাপ্লায়ার এসে কী বলে গেল তা তিনি ভাল করে শোনেনই নি।

এলাকে তিনি অপমান করেছেন। এরকম তো তাঁর স্বভাব নয়। কারুর সঙ্গেই তিনি রূঢ় ব্যবহার করেন না। বিশেষত একটি যুবতী মেয়ের সঙ্গে এ রকম কেন হলো?

সন্ধ্যের পর তার ড্রাইভার ছুটি চাইলো। দেশ থেকে তার কোন আত্মীয় আসবে। তাকে আনতে হাওড়া স্টেশন যেতে হবে। সাহেবকে বাড়ী পৌঁছে দেবার পর বাকি সন্ধ্যেটা ছুটি চায়।

অফিস থেকে ড্রাইভারকে ছেড়ে দিলেন জ্ঞানব্রত। অনেকদিন পর তিনি নিজে আজ গাড়ি চালাবেন। বুকে ব্যাথা হবার পর থেকে ডাক্তারের উপদেশে তিনি গাড়ি চালানো বন্ধ করে ছিলেন।

এ কি, এ তিনি কোথায় যাচ্ছেন? নিজের ব্যবহারেই অবাক হয়ে

যাচ্ছেন জ্ঞানব্রত। মনের কোন গভীর জায়গায় এইসব ইচ্ছে লুকিয়ে থাকে ? এদিকে এলার বাড়ি। এলা একদিন খুব অনুরোধ করছিল তার বাড়িতে কিছুক্ষণ বসবার জন্য।

প্রথম আলাপে এলা বলেছিল, সে ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলে থাকে। তারপর সে আলাদা ফ্ল্যাটের কথা উল্লেখ করেছিল। এলা তো চাকরি করে না। এ সব খরচ সে চালায় কি করে ? না, না, মেয়েটিকে কোনো ক্রমেই নষ্ট হতে দেওয়া চলেনা। তাঁর মেয়ে উজ্জয়িনী যদি একটা সুন্দর সুস্থ জীবন পায় তা হলে এলাই বা পাবে না কেন ?

এলার ঘরে গানের আওয়াজ আসছে। যদি ওখানে বড়ুয়া বসে থাকে ? বড়ুয়ার মতলব ভালো না, এলাকে সাবধান করে দিতে হবে। বড়ুয়াকেও বুঝিয়ে দিতে হবে যে, যে কোনো মেয়ের সঙ্গেই সে এরকম ব্যবহার করতে পারবে না।

দরজা খুলে এলা অবাক হয়ে গেল।

না, আর কেউ নেই, এলা একা একাই বসে গানের রেওয়াজ করছিল। এটা এলার দিদির ফ্ল্যাট। দিদি-জামাইবাবু বাইরে গেছেন বলে এলা কেয়ার টেকার।

জ্ঞানব্রত ভেবেছিলেন অনেক কিছু বলবেন এলাকে। তিনি শুধু বললেন, এসে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলুম।

—মোটেই না। শুধু ভাবছি আমার এত সৌভাগ্যের কারণটা কী ?

—তুমি গান গাইছিলে, তাই গাও, আমি শুনি।

—আপনি একদিন কী একটা ফোক্ সঙ-এর কথা বলছিলেন। আমি কিন্তু ফোক সঙ জানি না।

—তুমি যা জানো, তাই গাও।

হারমোনিয়াম নিয়ে এলা নিঃসঙ্কোচে গান ধরলো। রবীন্দ্র সঙ্গীত ঃ মধুর তোমার শেষ যে না পাই—।

এ গানটা জ্ঞানব্রত অনেকবার শুনেছেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, রবীন্দ্র সঙ্গীত সব পুরনো হয়ে গেছে। কিন্তু এই গানটা তো আবার নতুন করে ভালো লাগলো। এলার গলাটা সেরকম আহামরি কিছু না হলেও সুশ্রাব্য। চর্চা করলে ও একদিন নাম করতে পারবে।

—বাঃ, বেশ ভাল হয়েছে।

—আমি আপনার প্রশংসায় বিশ্বাস করি না। আপনি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে ছিলেন।

—না, না।

—আমি ঠিক বুঝেছি। আপনি সেই ফোক সঙটার কথাই ভাবছিলেন নিশ্চয়ই। কি সেই গানটা ?

—শহরে ষোলজন বোম্বেটে করিয়ে পাগল পারা··লালন ফকিরের গান।

—এই গানটার বিশেষত্ব কী ?

—সে রকম কিছুই না। আমি যে গান বাজনার খুব একটা ভক্ত, তাও না। তবু, রেডিওতে একদিন ওই গানটা শুনে আমি যেন কী রকম হয়ে গেলাম। আসলে আমার একটা হারিয়ে যাওয়া বাল্যকাল আছে। কয়েকটা বছরের কথা আমার কিছুই মনে পড়ে না। এই গানটা শুনে একটু একটু মনে পড়লো···কুষ্টিয়ায় থাকবার সময় একজন ফকিরের মুখে আমি এই গানটা শুনতাম···আমার দাদা মশাইয়ের কাছে আসতেন সে ফকির···। মনে হয় যেন একটু একটু

করে সব মনে পড়বে এবার···। অবশ্য এত সব মনে পড়া ভালো নয়।

—কেন ভালো নয়?

—মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ইদানীং, জীবনটা যদি আবার নতুন করে শুরু করা যেত!

—এ রকম চিন্তা আপনার মাথায় কে ঢোকালো? আপনি একজন সাকসেসফুল মানুষ, কোনোদিকেই অভাব নেই।

—তবু তো মনে হয়।

—আপনার বাড়িতে একজন গায়ককে এনে রেখেছেন, তাই না?

—হ্যাঁ···তুমি কী করে জানলে?

এলা এবার চোখ টিপে দুষ্টু মেয়ের মতন হাসলো। তারপর বললো, জানি··খবর রাখতে হয়···আমি আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু জানি।

—আমার তো কোনো গোপন কথা নেই।

—সেই গায়কের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিন না। আমি তা হলে কয়েকটা ফোক সঙ শিখে নিতে পারি। আপনি যখন ঐসব গান এত ভালোবাসেন।

হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠে জ্ঞানব্রত বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেবো। শোনো আমি সে কথাটাই তোমাকে বলতে এসেছি। তুমি আজে বাজে লোকদের সঙ্গে ঘুরো না। তুমি মন দিয়ে গান শেখো। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। আমি যদি মাসে মাসে তোমাকে ধরো হাজার দেড়েক টাকা দিই, তাতে তোমার খরচ চলে যাবে?

—অর্থাৎ আপনি আমাকে রক্ষিতা রাখতে চান?

কথাটা ঠিক একটা বুলেটের মতই জ্ঞানব্রতর বুকে লাগলো। ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাঁর মুখ।

—তুমি, তুমি আমাকে এই রকম কথা বললে।

—আপনার কথার কি এরকম মানে হয় না? আপনি শুধু শুধু আমাকে প্রত্যেক মাসে অত টাকা দেবেন কেন?

—মানুষ কি মানুষকে সাহায্য করে না?

—এদেশে কি গরীব গায়কের অভাব আছে? আপনি আমায় সাহায্য করতে চাইছেন আমি একটা মেয়ে বলেই তো? তা ছাড়া বৌদি কি ভাববেন?

—বৌদি?

—আপনার স্ত্রী তিনি যদি জানতে পারেন যে আমার মতন এক মেয়েকে আপনি প্রত্যেক মাসে এতগুলো টাকা দিচ্ছেন, তা হলে তিনি, ঐ আমি যা বললুম, ঠিক সেই কথাই ভাববেন।

একটা বিমষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে জ্ঞানব্রত বললেন, আমার ভুল হয়েছে। আমায় ক্ষমা করো।

তিনি উঠে দাঁড়াতেই এলা তাঁর কাছে এসে বললো, আপনার মুখ দেখলেই বোঝা যায়, আপনি মানুষটা খুবই ভালো। সত্যিকারের ভালো।

—আমি তোমায় অপমান করতে চাইনি।

যেন জ্ঞানব্রতই বয়েসে অনেক ছোট এইভাবে এলা গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বললো, তা আমি ঠিকই বুঝেছি। আপনি মনে দুঃখ পেলেন নাকি?

জ্ঞানব্রত আর কিছু না বলে এলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—আপনি যা ভাবছেন, আমার অবস্থা ততটা খারাপ নয়। আমার টাকা পয়সার কিছু ব্যবস্থা আছে। আমার বাবা রেখে গেছেন। তবে যে যেমন মনে করে, মেয়েদের একটা বয়স হলেই বিয়ে করে সংসার করা উচিত, সেইটাই সুখী জীবন, আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমি গান বাজনা নিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই। যার সঙ্গে ইচ্ছে হবে মিলবো, ইচ্ছে না হলে মিলবো না।

—আমি যাই ?

—কেন ? হঠাৎ উঠে পড়লেন যে।

জ্ঞানব্রতর একই হাত নিয়ে এলা নিজের গালে ছুঁইয়ে বললো, বুঝেছি আমার ও কথাটার জন্য আপনি আঘাত পেয়েছেন। আমি কিন্তু মজা করে বলেছি।

মজা ? কোনো মেয়ে নিজের সম্পর্কে এরকম একটা শব্দ প্রয়োগ করে মজা করতে পারে ? জ্ঞানব্রতর সব কিছুই যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

এরপর তিনি যা করলেন, সেরকম কিছু করবার কথা একটু আগেও তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি।

এলা এত কাছে, তার শরীরের উষ্ণতা, তার সান্নিধ্যের ঘ্রাণ যেন জ্ঞানব্রতকে অন্য সব কিছু ভুলিয়ে দিল। তিনি দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন এলাকে।

এলা একটুও আপত্তি করলো না। পাখি যেমন তার বাসায় গিয়ে বসে সেইরকমভাবে এলা জ্ঞানব্রতর বুকের আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে রইলো।

জ্ঞানব্রত যেন অন্য মানুষ। তিনি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমায় একটু আদর করি ?

এলা উঁচু করলো তার মুখটা। জ্ঞানব্রত তার ঠোঁটে ঠোঁট

ছোঁয়াতেই এলা বার করলো তার জিভ। অর্থাৎ চুম্বনটা যেন দায়সারা কিংবা সংক্ষিপ্ত না হয়।

সেই সময়টাতেও জ্ঞানব্রত এ কথা চিন্তা না করে পারলেন না যে তাঁর মেয়ে উজ্জয়িনীকেও এ রকম একজন বয়স্ক লোক জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে পারে। উজ্জয়িনীও কি এলার মতন এত সব জানে! পি. সি বড়ুয়াকে তিনি মনে মনে নিন্দে করছিলেন, বড়ুয়া সুযোগ সন্ধানী। কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখলেই ·। তিনিও কি নিরালায় সুযোগ নিয়ে এলাকে....

তক্ষণি জ্ঞানব্রত নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন। তাঁর মুখ লাল হয়ে গেছে।

এরপর দু'দিন মন থেকে সমস্ত অন্য রকম চিন্তা বাদ দিয়ে জ্ঞানব্রত শুধু কোম্পানীর কাজে মেতে রইলেন। যেন তিনি নিজেকে শাস্তি দিতে চান।

কিন্তু তাঁর পুরী যাওয়া হলো না।

তাঁর কারখানায় দুটি ইউনিয়ন। এর মধ্যে যে ইউনিয়নটি বেশী শক্তিশালী, তারা হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন ধর্মঘটের নোটিশ দিল। এ সময় জ্ঞানব্রতর বাইরে যাওয়া চলে না। অবস্থা এখনো হাতের বাইরে চলে যায় নি। আপোষ আলোচনায় মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

সুজাতা তৈরী হয়েই আছে। তাকে নিরাশ করা যায় না। জ্ঞানব্রত নিজেই প্রস্তাব দিলেন, সুজাতা একাই চলে যাক। হোটেল তো বুক করাই আছে, কোনো অসুবিধে হবে না। যদি কয়েকদিনের মধ্যে মিটে যায়, তাহলে জ্ঞানব্রত চলে যাবেন।

সুজাতা বললো, তাই যাই। দীপ্তি ফোন করেছিল, ওরাও এই শনিবারে পুরী যাচ্ছে। ঐ একই হোটেলে উঠবে।

দীপ্তির স্বামী মনীশ তালুকদার সুজাতাকে ছেলেবেলা থেকে চেনে। জ্ঞানব্রত পরে জানতে পেরেছিলেন যে বিলেতে ঐ মনীশ ছিল সুজাতার এক নম্বর প্রেমিক। অবশ্য তখন মনীশ ছিল মৌমাছি স্বভাবের, বিয়ের দিকে মন ছিল না। এই নিয়ে জ্ঞানব্রত কতবার মৃদু ঠাট্টা করেছেন সুজাতাকে।

—বেশ তো, ভালোই হবে তা হলে। ওদের সঙ্গে তুমি বেড়াতে টেড়াতে পারবে।

সুজাতা চলে যাবার দু'দিন বাদে এলা টেলিফোন করে জানালো, আপনি তো আলাপ করিয়ে দিলেন না। আমি কিন্তু নিজেই আলাপ করে নিয়েছি শশীকান্ত দাসের সঙ্গে।

জ্ঞানব্রত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় আলাপ হলো?

—রেডিও স্টেশনে। চমৎকার মানুষ। এত সরল আর অনেক গানের ষ্টক।

—হুঁ।

—উনি কলকাতা শহরের কিছুই চেনেন না। কাল আমি ওকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতরটা দেখিয়ে আনলুম।

—ও!

—আমি কিন্তু ঐ 'শহরে ষোলজন বোম্বেটে' গানটার প্রথম কয়েক লাইন এর মধ্যে তুলে নিয়েছি।

—আচ্ছা?

জ্ঞানব্রত ভেবেছিলেন এলার সঙ্গে তিনি কোনদিন দেখা করবেন

না। কিন্তু টেলিফোনটা ছাড়বার পরই তাঁর মনে হলো, কই এলা তো একবারও বললো না, আবার কবে দেখা হবে, কিংবা আমাদের বাড়িতে আসবেন!

একই সঙ্গে কাজের ব্যস্ততা আর অন্যমনস্কতা। কাজ তো করতেই হবে, অথচ প্রত্যেক দিন জ্ঞানব্রতর মনে পড়ছে এলার কথা। ছুটে যেতে ইচ্ছে করে এলার বাড়িতে। মেয়েটা কি তাঁকে জাদু করেছে? এতগুলো বছরে জ্ঞানব্রতর কখনো পদস্খলন হয় নি, আর এখন ঐ একটি মেয়ের জন্য! সুজাতার কাছে তিনি অপরাধ করছেন।

পুরীতে দীপ্তির চোখে ধুলো দিয়ে মনীশ কি সুজাতার সঙ্গে গোপন ঘনিষ্ঠতা করতে চাইবে না? এ সুযোগ কি মনীশ ছাড়বে? দীপ্তির চেহারাটা হঠাৎ বুড়িয়ে গেছে, সেই তুলনায় সুজাতার শরীরের বাঁধুনি এখনো কত সুন্দর।

সুজাতা কি আগেই জানতো যে মনীশরা এই সময় পুরীতে যাবে! সেই জন্যই ওর পুরীতে যাওয়ার এত উৎসাহ?

শশীকান্তর সঙ্গে বেশ কয়েকদিন দেখা হয়নি জ্ঞানব্রতর। একই বাড়িতে থাকলেও সুযোগ হয় না। দেখা হলো রাস্তায়।

জ্ঞানব্রত কারখানায় যাচ্ছিলেন। পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা ট্যাক্সি। সেই ট্যাক্সিতে এলা আর শশীকান্ত। হাতে জলন্ত সিগারেট, শশীকান্তের চুল পরিপাটি ভাবে আঁচড়ানো, এলার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। সেই হাসি আর চোখের দৃষ্টি অন্যরকম। জ্ঞানব্রত পরিস্কার দেখতে পেলেন শশীকান্তের চোখে-মুখে এলার জাদু।

তাঁর বুকের মধ্যে ঢুক্ ঢুক্ শব্দ হতে লাগলো। কঠিন হলো

চোয়াল। শশীকান্ত তাঁর আশ্রিত, সামান্য একটা গ্রাম্য লোক, তার এতটা বাড়াবাড়ি! কোথায় যাচ্ছে এখন? এই দিকেই এলার বাড়ি। শশীকান্তর উচিত ছিল না একবার জ্ঞানব্রতর কাছ থেকে অনুমতি নেবার?

ট্যাক্সিটা এখনো চোখের আড়ালে যায় নি, জ্ঞানব্রত তাঁর ড্রাইভারকে বললেন, সোজা চলো।

যেমন ভাবেই হোক এলাকে রক্ষা করতে হবে। যার তার সঙ্গে এমন ভাবে এলার মেলামেশা কোনোক্রমেই চলতে পারে না। এলার ফাঁকা ফ্ল্যাটে এই সময় শশীকান্তকে নিয়ে যাচ্ছে কেন? গান শেখার জন্য—এই দুপুরবেলা? শশীকান্ত গ্রামের লোক। এলার মতন মেয়েদের সঙ্গে ওর মেলামেশার অভ্যেস নেই, মাথা ঠিক রাখতে পারবে না।

একটা চৌরাস্তার মোড়ে এসে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, এবার কোন দিকে?

এক মুহূর্তের জন্য যেন জ্ঞানব্রতর রক্ত চলাচল থেমে গেল। 'কোন দিকে' কথাটা যেন একেবারে নাড়িয়ে দিল তাঁর চৈতন্য। এ তিনি কি করছেন? এলাকে শাসন করতে গেলে যদি আবার সে একটা মর্মভেদী কথা ছুঁড়ে দেয়? সেদিন এলা বলেছিল, সে স্বাধীন থাকতে চায়। যার সঙ্গে খুশী তার সঙ্গে মিশবে....। এলা তো তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। কারখানায় ইউনিয়নের সাথে তাঁর একটা গুরুতর বৈঠক বসবার কথা এখন, আর তিনি ছুটছেন একটা মেয়ের পেছনে।

পুরীতে মনীশ যদি সুজাতাকে....। মনীশ ঠিক নিভৃত সুযোগ করে নেবে, ও এখনও রীতিমতন প্লেবয় ধরনের। বিভিন্ন পার্টিতে তিনি

দেখেছেন মনীশ পরস্ত্রীদের পিঠে হাত রাখে। কিন্তু সুজাতা কি রাজি হবে? তিনি যদি গোপনে এলার বাড়িতে গিয়ে তাকে চুমু খেতে পারেন তা হলে সুজাতাই বা কেন....উজ্জয়িনী কাল রাত এগারোটার সময় বাড়ি ফিরেছে। এত রাত পর্যন্ত ও কোথায় থাকে, কার সঙ্গে মেশে। জ্ঞানব্রতরই মতন অন্য কোনো লোক যদি উজ্জয়িনীর মতন একটা অল্প বয়েসী মেয়ের মন জয় করতে চায়?

জ্ঞানব্রত একবার ভাবলেন। সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে এলাকে নিয়ে নতুনভাবে আবার জীবন শুরু করলে হয় না?

তারপরেই ভাবলেন, না, না। ঐ ষোলজন বোম্বেটেকে সব কিছু লুটেপুটে নিতে দেওয়া হবে না। আটকাতে হবে। মাথা ঠিক রাখতে হবে।

তিনি কড়া গলায় ড্রাইভারকে বললেন, কোন দিকে আবার? রোজ যেদিকে যাই সেদিকে যাবো!

জীবনের পঞ্চাশটা বছর পেরিয়ে এসেছেন জ্ঞানব্রত। তাঁর সব রাস্তা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর অন্য কোনো দিকে ফেরা যাবে না।

———